সমসাময়িক প্রসঙ্গ

রজব ও শা'বান : প্রেক্ষিত মধ্যপন্থা বনাম প্রান্তিকতা

মুফতী হাফিজুর রহমান

মহিমান্বিত রমাযান মাসের পূর্বে আমাদের সামনে রয়েছে দুটি মাস; রজব ও শা'বান। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা রজব এবং শা'বান মাসের পালনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

রজব মাস

রজবের শাব্দিক অর্থ সম্মান। জাহেলী যুগে মানুষ এ মাসকে সম্মান করতো বলে এর নামকরণ হয়েছে রজব। এ মাসকে 'রাজাবু মুযার'ও বলা হয়। কারণ মুযার গোত্রীয় লোকেরা এ মাসকে সর্বাধিক মর্যাদায় ভূষিত করতো। (আস-সিহাহ ফিল-লুগাহ ১/২৪৩)

রজব মাসের ঐতিহাসিক একটি বিশিষ্টতা ও পটভূমি রয়েছে। আছে এর শব্দগত ও নামগত আরো তাত্ত্বিক আলোচনা। আমরা সেদিকে অগ্রসর হবো না। তবে রজব 'আশহুরে হুরুম' অন্তর্গত একটি অন্যতম সম্মানিত মাস। আরবের পৌত্তলিকরা এ মাসকে কেন্দ্র করে পশু বলিসহ নানা রকম কুসংস্কৃতি চর্চায় বুঁদ হয়ে থাকত। তারা এ মাসের মর্যাদা চর্চায় প্রান্তিকতা ও গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতো। এমন কি রজব মাস উদযাপনে তারা যুদ্ধ বিগ্রহ আর রক্তপাতের মতো অতি আবশ্যক(?) ব্রতটিকেও 'সাজঘরে' পাঠিয়ে দিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাস কেন্দ্রিক এ জাতীয় নষ্ট কালচারের আমূল সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু আক্ষেপের কথা হল, আজকের মুসলিম সমাজে রজব মাস কেন্দ্রিক সে নষ্ট আচার-আনুষ্ঠাকিতা দীনী শিরোনামে নব অবয়বে চর্চিত হচ্ছে। নিম্নে রজব মাস কেন্দ্রিক এসব রসম-রেওয়াজের কিছু ফিরিস্তি 'বর্জনীয় বিষয়' শিরোনামে তুলে ধরা হচ্ছে।

বর্জনীয় বিষয়

(১) সালাতুর রাগায়েব : এটি 'লাইলাতুর রাগায়েব' তথা রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিশেষ নিয়মের নামায; যা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ নিয়মে আদায় করা হয়। এর বিনিময়ে পূণ্য-নেকীর ফল্গুধারা প্রাপ্তির সরল বর্ণনা এসেছে। এটি একটি জাল বর্ণনা। আল্লাম আবু বকর মুহাম্মদ তুরতূশী রহ. বলেন, ৪৮০ হিজরীর পরবর্তী যুগে বাইতুল মাকদিসে এ জাতীয় সালাতের উদ্ভব হয়েছে। এর আগে এসবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. বলেন, এটি একটি ঘৃণিত বিদআত। হিজরী বর্ষের চার শত বছর পরে সিরিয়া ভূখণ্ডে এর উদ্ভব হয়েছে। এরপর এখান থেকে অন্যান্য অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। (আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী, আল-আসারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওযুআহ ১/৬২,৭২, ১৩৭, ইমাম শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমু'আহ ১/৪৮, ইমাম যাহাবী, তালখীসু কিতাবিল মাউযুআত ১/১০৭)

(২) 'শবে এস্তেফতাহ' এর নামায : ১৪ রজব দিবাগত রাতে বিশেষ নিয়মে চার বা পঞ্চাশ রাকাত নামায আদায়োত্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ দুরূদ, তাসবীহ-তাহমীদ ও তাহলীল আদায় করে এস্তেফতাহের এ নামায আদায় করা হয়। এ নামাযের বিনিময়েও পূণ্য-মার্জনা প্রাপ্তির ফুলঝুরি দেখানো হয়েছে। এটিও একটি জাল বর্ণনা। (আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী, আল-আসারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওযুআহ ১/১১২)

(৩) সালাতে ওয়াইস কারনী : ৩, ৪ অথবা ৫ রজবের প্রথম প্রহরে সীমাহীন সাধনাযোগে বিশেষ নিয়মে ছয় রাকাত নামায আদায়ের মাধ্যমে এ নামায আদায় করা হয়। এটিও একটি জাল বর্ণনা। (আল-আসারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওযুআহ ১/১১১)

এছাড়া রজবের প্রথম রাত্রিতে মাগরিবের নামাযের পর বিশেষ নিয়মের বিশ বা চল্লিশ রাকাত নামায, ১৪ রজবের দিবাগত রাত্রিতে চৌদ্দ রাকাত নামায, ২৬ রজব দিবাগত রাতের ১২ রাকাত নামায, এ মাসে আয়াতুল কুরসী এবং একশত বার সূরা ইখলাস পাঠ সম্বলিত বিশেষ নিয়মের চার রাকাত নামায, এ মাসের শেষ জুমু'আয় পঠিত বিশেষ নিয়মের বার রাকাত নামায এবং এ মাসের শেষ তারিখের দিবাগত রাতের বিশেষ নিয়মের বার রাকাত নামায– এসবই জাল বর্ণনা আশ্রিত নামাযের বিবরণ। আল-আসারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওযুআহ, ইবনুল জাউযী রহ. রচিত কিতাবুল মাউযুআতসহ বিভিন্ন মাউযু হাদীস গ্রন্থে রজব মাসের এ জাতীয় নামাযের অপাঙক্তেয়তা প্রমাণে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে। ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর নামে প্রচলিত গুনইয়াতুত তালিবীন, আবু তালেব মাক্কী কৃত কুতুল কুলূব এবং বাংলা মোকসেদুল মোমেনীন, নেয়ামুল কুরআন, আমালুল কুরআন, বার চান্দের আমল প্রভৃতি পুস্তিকায় চটকদার জাল হাদীসের ভাষায় সালাতুর রাগায়েবসহ এজাতীয় নামাযের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। বর্ণনাগুলো সর্বৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট। মানব রচিত এ জাতীয় 'হাদীসের' ওপর আমল করার কোনোই সুযোগ নেই। কষ্টসাধ্য এসব নামায আদায় করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপের শাস্তি প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি অর্জন ব্যতিরেকে আর কিছুই লাভ হবে না।

(৪) রজব মাসের নির্দিষ্ট দিন-তারিখের রোযা : রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের রোযা, মি'রাজের রোযা তথা ২৭ রজবের রোযা, এ মাসে এক থেকে পনেরটি রোযা পালন এবং প্রত্যেক সংখ্যক রোযার জন্য আলাদা আলাদা পূণ্য-মার্জনার সমাহার প্রদর্শন, তেমনিভাবে তিন, সাত, আট, পনের এবং পূর্ণ রজবের রোযার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাহাত্ম্যের বর্ণায়নসহ রজব মাসের বিভিন্ন দিন তারিখের রোযা সম্বলিত যেসব হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের নামে সমাজে বা বই-পুস্তকে প্রচলিত আছে তা সবই হাদীস শাস্ত্রবিদদের মতে ভিত্তিহীন এবং অপাঙক্তেয়। এ জাতীয় রোযা রেখে উপোস থাকার কোনোই সুযোগ নেই। বিশিষ্ট তাবেয়ী আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. পূর্ণ রজব মাস রোযা রাখতে নিষেধ করতেন; যাতে এ মাসকে উৎসব হিসেবে উদযাপন না করা হয়। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (হা.নং ৭৮৫৪)

(৫) পশু জবাই : আনুমানিক ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের দিকে বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের অন্তর্গত 'চিশত' এলাকা থেকে ভারতের আজমীর শহরে আগমন করেন মহান সাধক মনীষী মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. (৬২০/৬২৭/৬৩৩/৬৩৪হি.)। এ মহান সাধকের মৃত্যু

দিবসকে কেন্দ্র করে ভারতের আজমীরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উরস-উৎসবের আয়োজন করা হয়। মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. কিংবা আজমীর 'শরীফ'-এর নামে মানুষ পশু মানত করে। মানতের সেসব পশু এসব উরসে জবাই করা হয়। এটা আরব্য জাহেলী যুগের নতুন বলিপ্রথা বৈ কিছুই নয়। জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের প্রতিমাদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে পশু বলি দিয়ে রজব মাস উদযাপন করতো। আবু হুরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামে আতীরা তথা রজব মাসের প্রথম দিনে প্রতিমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পশু বলি দেয়ার প্রথা নেই। (সহীহ বুখারী হা.নং ৫৪৭৪, ফাতহুল বারী ২০/৩৯১)

রজব মাসের এ পশু বলিদানকে কেন্দ্র করেই ترجيبُ العَتِيرَةِ শব্দটির প্রচলন হয়। অর্থাৎ রজব মাসে প্রতিমার উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জন দেয়া। সুতরাং প্রতিমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পশু বলিদান এবং মাজার কিংবা কোনো ব্যক্তির উদ্দেশে পশু জবাই বিধানগত দিক থেকে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। বাস্তবে এ দুটোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টিই স্পষ্ট শিরক। (তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব ১/ ২৫, শাহরু রাজাব বাইনাল মুবতাদা' ওয়াল মাশরু' ৩, মাহামূদ আব্দুর রউফ, আল-কাশফু আন হাকীকাতিস সুফিয়াহ ১/৩৪০)

(৬) আজমীরী ডেগ চর্চা : মহিমান্বিত এ রজব মাসে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, অলিগলিতে লাল কাপড়ে মোড়ানো কিম্ভূতকিমাকার বহু রঙিন ডেগ চোখে পড়ে। 'আজমীর'ভক্ত ভাইয়েরা মুঈনদ্দীন চিশতী রহ. এর মৃত্যু দিবস পালনের উদ্দেশ্যে অর্থের যোগান দিতে এ ডেগ পন্থার আবিষ্কার করেছেন। আর আত্মভোলা কিছু মানুষ এদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে এসব ডেগ-ডেগচিতে নিয়ায মানতের অর্থ দিয়ে নিজেদের ঈমান-আমলকে ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। এসব ঈমান হরণকারী ডেগে টাকা দেওয়াও নিষেধ এবং এ টাকায় সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য আহার করাও নিষেধ।

একটি প্রশ্ন, মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. কি রজব মাসে ইন্তেকাল করেছিলেন? বিশুদ্ধভাবে কি তাঁর ইন্তেকাল-মাস প্রমাণিত? বস্তুত তিনি ঠিক কত হিজরী সনে ইন্তেকাল করেছেন তা নিয়েই বিতর্ক রয়েছে। ৬২০, ৬২৭, ৬৩৩, ৬৩৪ হিজরী– তাঁর মৃত্যু সনের এ চারটি মত পাওয়া যায়। মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.এর সুনির্দিষ্ট মৃত্যু-তারিখটি বোধ হয় ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। আমাদের সমাজে ধোঁয়াশাচ্ছান্ন মৃত্যু কিংবা জন্ম দিবস উদযাপনের অনেক নযীর রয়েছে। অথচ মৃত্যু বা জন্ম দিবস কেন্দ্রিক উৎসব পালন করার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। (তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব; ২৫)

(৭) শবে মি'রাজ উদযাপন : ১৭ মে (০৩ জ্যৈষ্ঠ), ২৭ রজব 'শব-ই-মিরাজ' উপলক্ষে সরকারী ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারী ছুটিই প্রমাণ করে এ দিবসটির গুরুত্ব কত বেশি! মিরাজের ব্যাপারটি একটি তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নতুন কিছু আবিষ্কার করে ধর্মাচারের রূপ দান করার কোনো সুযোগ ইসলামে আছে কি না তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। মিরাজের রাত্রিকে কেন্দ্র করে কোনো আচার আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন ইসলাম-অনুমোদিত নয়। উপরন্তু বিদগ্ধ উলামায়ে কেরামের মতে 'মি'রাজের ঘটনাটি রজব মাসে হয়েছে' এটা লোকমুখে প্রসিদ্ধ হলেও ঐতিহাসিকভাবে সুনিশ্চিত স্বীকৃত নয়। সীরাত-ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে মিরাজের তারিখ নিয়ে বহু উক্তি রয়েছে। এ কারণে সুনির্দিষ্ট করে মিরাজের রজনী ঘোষণা করার অবকাশ নেই। আর ২৭ রজবের ব্যাপারে ইমাম ইবরাহীম হারবী, ইবনে রজব হাম্বলীসহ অনেকে স্পষ্ট করেই বলেছেন, এ রাতে মিরাজ সংঘটিত হয় নি। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে মিরাজের ঘটনা হিজরতের এক বা দেড় বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মাস, দিন তারিখের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়াও এ মাসের আমল হিসেবে অন্নদান করা, বস্ত্রদান করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, জানাযা পড়া, পানীয় পান করানো, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া, কুরআন খতম করা ইত্যাদির বিনিময়ে অফুরন্ত ফযীলত লাভসহ দু'আ কবুল হওয়া এবং বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সংক্রান্ত যেসব হাদীস সমাজে প্রচলিত আছে তার সবই ভিত্তিহীন, জাল ও বানোয়াট। (তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব ১/২০-২৫, লাতায়িফুল মা'আরিফ ১/১২৬)

সারকথা, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, 'স্বতন্ত্রভাবে রজব মাসের মাহাত্ম্য, এ মাসের বিশেষ দিনের রোযা এবং বিশেষ নিয়মের নামায সম্বন্ধে প্রমাণযোগ্য কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি। (তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব ২)

পালনীয় বিষয়

কুরআন-হাদীসের ভাষ্য মতে রজব একটি সম্মানিত মাস। তবে এ মাসে সুনির্দিষ্টভাবে পালন করার মতো কোনো বিষয় নেই। হাদীস ও আসারের বর্ণনায় এ মাসের সম্মান ও মর্যাদা বিবেচনায় যাবতীয় পাপাচার পরিহার করা এবং স্বাভাবিক ইবাদতে অধিক মনোযোগী হওয়ার কথা এসেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

অর্থ, তোমরা সম্মানিত এ মাসগুলোতে নিজেদের উপর অবিচার করো না। (সূরা তওবা- ৩৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বারটি মাসের মধ্য হতে চারটি মাসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোকে সম্মানিত করেছেন এবং এ মাসের পাপাচারকে অধিক গুরুতর করেছেন।' (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ৩৫/১৩০)

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ রাযি. উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ' তোমরা এ মাসগুলোতে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে এবং তাঁর আনুগত্য পরিত্যাগ করে নিজেদের উপর অবিচার করো না। (প্রাগুক্ত ৩৫/১৪২)

সালেম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত মাসগুলোতে রোযা রাখতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ৭৮৫৬)

উসমান ইবনে হাকীম রহ. বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. কে রজব মাসের রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কে বলতে শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোযা রাখতেন তখন এত পরিমাণ রোযা রাখতেন, আমরা ভাবতাম, তিনি আর রোযা পরিত্যাগ করবেন না। আবার যখন তিনি রোযা না রাখা শুরু করতেন তখন আমাদের মনে হতো, তিনি আর রোযা রাখবেন না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৭৮২)

হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. এ হাদীস উপস্থাপন করে এ কথা প্রমাণ

করতে চান, রজব মাসের রোযা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নিষেধাজ্ঞা বা বিধি-আজ্ঞা নেই। বরং এ মাসের রোযার বিধান স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য মাসের নফল রোযার মতো। তবে সুনানে আবু দাউদের একটি বর্ণনামতে সম্মানিত মাসগুলোতে রোযা রাখা বাঞ্ছনীয় বলে প্রমাণিত। সেখানে বলা হয়েছে, জনৈক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অধিক রোযা রাখার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তিনবার বলেন, সম্মানিত মাসগুলোতে রোযা রাখো এবং মাঝে মধ্যে পরিত্যাগ করো। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২৪২৮, শরহু সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী ১৭/৩৮)

আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. তাঁর গোলাম আব্দুল্লাহকে ইবনে উমর রাযি.-এর কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, আমি শুনতে পেলাম, আপনি তিনটি বিষয়কে নিষিদ্ধ করেছেন। ... (তন্মধ্য হতে একটি হল,) রজব মাসের রোযা। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখে সে রজবের রোযাকে কী করে নিষিদ্ধ মনে করতে পারে?... (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৫৩০)

তবে এ মাসের মর্যাদাকে পুঁজি করে ইবাদতের স্বাভাবিক গতিধারাকে ব্যাহত করার কোনো সুযোগ নেই। উমর রাযি. কিছু লোককে রজব মাসের রোযার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করতে দেখে তাদেরকে আহার গ্রহণে বাধ্য করেন এবং বলেন, এ মাসকে তো জাহেলী যুগের লোকেরা সীমাতিরিক্ত সম্মান করত। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১৬/২৯৪)

শা'বান মাস

শা'বানের শাব্দিক অর্থ ছড়িয়ে পড়া, বিস্তৃতি লাভ করা। জাহেলী যুগের লোকেরা রজব মাসের সম্মানার্থে যুদ্ধ বিরতি প্রক্রিয়া গ্রহণ করতো। রজব মাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ শেষে শা'বান মাসের সূচনা হলে তারা নতুন উদ্যমে ব্যাপকহারে লুটপাট ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশে ছড়িয়ে পড়ত। এ জন্য রজব মাসের পরবর্তী এ মাসকে শা'বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। (মুনাভী, আত-তাউকীফ আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ ১/৪৩১)

এ মাসটি যদিও কুরআনে বর্ণিত 'আশহুরে হুরুম' এর পদমর্যাদায় ভূষিত হয় নি তবুও হাদীস এবং আসারের বিবরণে নানা আঙ্গিকে এ মাসের মর্যাদা ও বিশিষ্টতার কথা আলোচিত হয়েছে। জাহেলী যুগে মহিমান্বিত এ মাসটি যদিও ব্যাপকহারে অনাচারের শিকার হয় নি কিন্তু হালে মাহাত্ম্যপূর্ণ এ মাসটি দু শ্রেণীর মানুষের চরম প্রান্তিকতা ও নানাবিধ নিগ্রহের শিকার। এতে এ মাসের স্বাভাবিক মূল্যবোধ ও সম্মানটুকুও ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আমরা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ মাসের বর্জনীয় ও পালনীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

বর্জনীয় বিষয়

(১) হালুয়া রুটির পঙ্কিল সংস্কৃতি : সমাজে শবে বারা'আত তথা মুক্তির রজনীকে কেন্দ্র করে হালুয়া-রুটির আয়োজন বেশ ঘটা করেই চলছে। এটাকে তারা 'পরম পূজনীয়' বিষয় বলেই জ্ঞান করে থাকে। অথচ এ ধরনের মনগড়া রসনাবিলাসী আয়োজনের কোনোই ভিত্তি নেই।

হাদীসের নামে জাল কিছু বর্ণনাকে কেন্দ্র করে সমাজে নানা রকম আচার আনুষ্ঠানিকতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ধর্মের নামে সেসব ধর্মাচার অপাঙক্তেয় হলেও তার একটি ঠুনকো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু হালুয়া-রুটির প্রাদুর্ভাব কোন সূত্রটিকে ঘিরে আবর্তিত তার প্রেক্ষাপট আমরা খুঁজে পাই নি। আশুরার দিনে ভাল খাবারের আয়োজনের ব্যাপারে একটি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়। হাদীসটির কার্যকারিতা নিয়ে বিদগ্ধ উলামা মহলে বিতর্ক থাকলেও তার একটি বর্ণনানুগ সূত্র আছে। বস্তুত খাবার আয়োজন নিয়ে শরীয়তের বিশেষ কোনো বিধি নিষেধ নেই। কিন্তু বৈধ কোনো বিষয়ের স্বাভাবিক গতিধারা যদি সময়কেন্দ্রিকতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয় কিংবা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে তখন তা বৈধতার আবেদন হারিয়ে ফেলে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে হালুয়া-রুটির আয়োজন বিধিসম্মত হলেও তা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে প্রথাগত রূপ নেয়ায় তা আর শরীয়তসম্মত নেই; বরং অবশ্যপরিত্যাজ্য হয়ে গেছে। (ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ১৭/১৭ [শামেলা সংস্করণ])

(২) আলোক-সজ্জার ঝিলিমিলি আয়োজন : লাইলাতুল বারা'আতকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর মানুষ দোকান-পাট, বাসা-বাড়ী এমনকি আল্লাহর ঘর মসজিদের দেয়ালেও ঝুলিয়ে দেয় বাহারী ঝিলিমিলি বাতি। মূলত এটি অগ্নিপূজার অন্যতম একটি অনুষঙ্গ। অমিতব্যয়ের এ আলো ঝলকানিতেও তারা নেকী-পূণ্যের সমাহার খুঁজেন। স্বাভাবিক সাজসজ্জা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তা যদি স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন তা আর বৈধ থাকে না; নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ আলোকসজ্জায় যেমন আছে মাত্রাহীন অর্থ অপচয় তেমনি আছে ধর্মাচারের নামে সীমাহীন বাড়াবাড়ি। তাই এ জাতীয় সূত্রবিহীন আচার-আনুষ্ঠানিকতা ইসলাম সমর্থন করে না। এসব অনাচারের প্রাদুর্ভাব রোধে কর্মতৎপর হওয়া আবশ্যক। (ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ১৭/১৭ [শামেলা সংস্করণ], আল-আসারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাউযু'আহ ১/৭১)

(৩) আতশবাজির ধর্মহীন উন্মাদনা : যেসব ভাইয়েরা শবে বরাতের নব আবিষ্কৃত আচার-আনুষ্ঠানিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট তারা কি এ রাতের আতশবাজিকেও পূণ্যের বিষয় বলে মনে করেন? জানি না, এ ব্যাপারে তাদের লালিত ধারণাটা কি। যদিও এ বিষয়টির সাথে আবেগী যুবসমাজই বেশি যুক্ত থাকে। ধর্মীয় বিষয়ে মতভিন্নতার ফিরিস্তি নাতিদীর্ঘ হলেও দীন বিষয়ে জানাশোনা এমন কোনো মানুষ পাওয়া দুষ্কর হবে যারা অনর্থক এবং মানবতা বিরোধী এ পটকাবাজিকে বিধানিক বলে মত পেশ করবেন। অথচ মহিমান্বিত একটি রাতকে কেন্দ্র করে এ পটকাবাজির চর্চা হচ্ছে। এতে ইবাদতে নিমগ্ন মানুষের মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে, ঘুমন্ত মানুষের ঘুমকে হারাম করে দেয়া হচ্ছে। একটি পাপাচারের সাথে হাজারো পাপাচার এসে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আইন করেও এ জাতীয় পাপাচারের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। এই সবই মুক্তির রজনী নিয়ে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির অশুভ পরিণতি।

(৪) মাজার-কবরে নারী পুরুষের অবাধ জমায়েত : ১৪ শা'বান দিবাগত রাতে কবর-মাজারগুলোতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আপামর জনতার ঢল নামে। সেখানে গিয়ে তারা এমন এমন আচার আনুষ্ঠানিকতায় লিপ্ত হয় যা ইসলামী শরীয়ত আদৌ সমর্থন করে না। নারীদের কবরস্তানে গমনের ব্যাপারে এমনিতেই বিধি-নিষেধ রয়েছে। সেখানে পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে মাজার-কবরে অবাধ যাতায়াতের ব্যাপারটি কিভাবে বিধিসম্মত হতে পারে। কবর যিয়ারত একটি কাঙ্ক্ষিত এবং পূণ্যময় বিষয়। সহীহ হাদীসের বর্ণনায় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। কিন্তু দিন তারিখ

নির্দিষ্ট করে সেটাকে সম্মিলিত পোষাকী রূপ দেয়া আদৌ শরীয়তসম্মত নয়। (ইবনুল হাজ্জ, আল-মাদখাল ১/২৯৯-৩১৩,)

(৫) শবে বরাতের 'গোসল-স্নান' : অনেকে শবে বরাত উদযাপনের উদ্দেশে এ রাতে গোসলনীতি পালন করে থাকেন। ফুটপাথীয় কোনো পুস্তকে হয়েতো দেখেছেন, এ রাতে গোসল করলে পানির ফোঁটায় ফোঁটায় নেকির ফল্গুধারা বয়ে যাবে। কিন্তু ভাইয়েরা এসব 'রূপকথা'র শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে দেখেন না। এ রাতের গোসলের মাহাত্ম্যের ব্যাপারে একটি জাল বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনাটিতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বরাতের রাতে ইবাদত পালনের উদ্দেশে গোসল করবে তার গোসলের প্রতি ফোঁটা পানির বিনিময়ে আমলনামায় ৭০০ রাকাআত নফল নামাযের পূণ্য লেখা হবে। বানোয়াট এ বর্ণনাটিকে ঘিরেই 'হিন্দুয়ানী স্নানব্রত' সদৃশ এ পরগাছার জন্ম হয়েছে। (যাইলুল মাকাসিদিল হাসানাহ, যাইলু তানযীহিশ শরী'আহ, শা'বান মাস অধ্যায়। হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা., প্রচলিত জাল হাদীস ১০৫)

(৬) বিশেষ পদ্ধতির সালাত আদায় : বারা'আতের এ রজনীতে নামায পড়ার বহু রকমের নিয়ম পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত আছে। মানুষ না জেনে না বুঝে কষ্টসাধ্য এসব নামাযের পেছনে মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করে। এতে পণ্ডশ্রমের সাথে সাথে জাহান্নামে যাওয়ার পথ আরো অবারিত ও মসৃণ হয়। ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, আমি কিছু মানুষকে দেখেছি, তারা সারা রাত জেগে হাজার হাজার বার বিভিন্ন সূরা যোগে এ জাতীয় নামায আদায় করে। এরপর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফজর নামায কাযা করে ঘুমিয়ে থাকে। সুতরাং এ রাতের এক হাজার বার সূরা ইখলাস সম্বলিত একশত রাকাত নামায, একত্রিশ বার সূরা ইখলাস সম্বলিত বার রাকাত নামায, বিশেষ পদ্ধতির চার রাকাত খাসমা'র নামায, সেজদার বিশেষ দু'আ সম্বলিত নামায, বিশেষ কিরাত সম্বলিত চৌদ্দ রাকাত নামাযসহ আরো যত প্রকার বিশেষ প্রকৃতির নামায রয়েছে সবই বানোয়াট। এসবের কোনো ভিত্তি নেই। এসবের পেছনে শ্রম দিয়ে পাপ কামাই করার কোনো অর্থ হয় না। (আল-আসারুল মারফু'আ ফিল আখবারিল মাউযুআহ ৭৮-১১৪, ইমাম ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাউযুআত ২/১৩০)

(৭) লাইলাতুল বারা'আতকে লাইলাতুল কদরের সমমর্যাদায় বা ততোধিক মর্যাদায় ভূষিত করা : শবে বরাতের মহিমা শুধু হাদীসের ভাষ্যে প্রমাণিত। কিন্তু লাইলাতুল কদরের মর্যাদা স্বয়ং কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। অথচ মানুষ সেই শবে কদরের চেয়েও শবে বরাতকে শ্রেষ্ঠতর মনে করছে। কেউ কেউ ভাষ্যে কিংবা বিশ্বাসে এ কথার জানান দিচ্ছে। কেউ বা আচার আনুষ্ঠানিকতায় তার প্রমাণ দিচ্ছে। কারণ শবে কদরের সময় ইবাদত-বন্দেগী নিয়ে এত মাতামাতি আর এত পরিমাণে বর্ণাঢ্য আয়োজন লক্ষ্য করা যায় না। এতেই প্রমাণ হয়, তাদের নিকট শবে বরাত যতটা গুরুত্বপূর্ণ শবে কদর ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা নিতান্তই আপত্তিকর এবং অতীব গর্হিত ব্যাপার। এ জাতীয় ধ্যান ধারণার আশু অপনোদন জরুরী।

ইবাদাতকে সম্মিলিত এবং আনুষ্ঠানিক রূপ দান

শবে বরাতের মাহাত্ম্য সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত। এ রাত উদযাপনের বিশেষ কোনো পন্থা উদ্ভাবন না করে এবং সম্মিলিত ও আনুষ্ঠানিক রূপ না দিয়ে সাধারণ ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকাও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আজকাল বিশেষ নিয়মে সম্মিলিত ও আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে যেভাবে শবে বরাত উদযাপনের প্রক্রিয়া চলছে তাতে শবে বরাতের স্বাভাবিক ধর্মাচারের গতিধারা ব্যাহত হয়। নির্দিষ্ট সময় করে ওয়াজ নসীহত এরপর দুআ-মুনাজাত এবং তাবারক বিতরণী– এসবই অতিরঞ্জন এবং বাড়াবাড়ি পর্যায়ের কর্মপদ্ধতি। এগুলো পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। মসজিদ মূলত ফরজ নামাযের জন্য। নফল নামায নিজ নিজ গৃহে আদায় করা উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায নিজ গৃহে আদায় করতেন। এ সম্বন্ধে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা শবে বরাতের রাতে যে অতিরিক্ত নামায আদায় করি তা সবই নফল নামাযের পর্যায়ভুক্ত। ইবনে উমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু নামায আদায় করো। তোমাদের ঘরগুলোকে কবর-সমাধি বানিয়ে রেখো না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৩২)

পালনীয় বিষয়

শা'বান মাস পবিত্র রমাযান মাসে প্রবেশের সেতুবন্ধ। এ মাসের পথ ধরেই রমাযানের অফুরন্ত পূণ্যাশীষ ও কল্যাণ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে শা'বান মাসের আলাদা একটি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তাছাড়া স্বতন্ত্রভাবে শা'বান মাসের ইবাদত ও মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে শা'বান মাস বিষয়ে আলাদা আলাদা অধ্যায় রচিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে ইবাদতে মনোযোগী হতেন। উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল! আপনি শা'বান মাসে যে পরিমাণ রোযা রাখেন অন্য কোনো মাসে আপনাকে সে পরিমাণ রোযা রাখতে দেখি না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি রজব এবং শা'বানের মধ্যকার এমন একটি মাস যার মাহাত্ম্য সম্পর্কে মানুষ উদাসীন। এটি এমন একটি মাস যে মাসে মানুষের আমলের হিসাব নিকাশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে উত্থাপন করা হয়। সুতরাং আমি চাই আমি রোযারত অবস্থায় আমার কার্যতালিকা আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্থাপিত হোক। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ২৩৫৭)

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একমাত্র রমাযানেই পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখেছি। আর তাঁকে শা'বান মাসের তুলনায় অন্য কোনো মাসে এত অধিক পরিমাণে রোযা রাখতে দেখেনি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৬৯)

অন্য একটি বর্ণনায় আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের চেয়ে বেশি অন্য কোনো মাসে রোযা রাখতেন না। কারণ তিনি নিয়মিত শা'বান মাসের রোযা রাখতেন। (প্রাগুক্ত; হা.নং ১৯৭০)

এ ছিল শা'বান মাসের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব। এসব বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, পূর্ণ শা'বান মাস জুড়েই ইবাদতের ব্যাপারে তুলনামূলক বেশি যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য দিকে শা'বান মাসের বিশেষ একটি অংশের ব্যাপারে স্বতন্ত্র তাৎপর্য এবং মাহাত্ম্যের কথা হাদীসের কিতাবগুলোতে আলোচিত হয়েছে। আর সে অংশটি হলো ১৪ শা'বান দিবাগত রজনী। হাদীসের ভাষায় মহিমান্বিত এ রজনী 'লাইলতুন নিসফি মিন শা'বান' আর সাধারণ মানুষের পরিভাষায় লাইলাতুল বারা'আত এবং শবে বরাত বা মুক্তির রজনী হিসেবে

পরিচিত। এ রজনীটিকে ঘিরে আমাদের কিছু ভাইয়েরা বিদআত প্রতিরোধের নামে মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ের শিথিলতার আশ্রয় নেন। অথচ যতটুকু বিদআত এবং ধর্মীয় অনাচারের পর্যায়ে পড়ে ততটুকুই রোধ করা প্রয়োজন ছিল। দেহের কোনো অঙ্গে অপারেশন পর্যায়ের ইনফেকশন হলে নির্দিষ্ট অঙ্গটিকেই অপারেশন করে কেটে ফেলতে হয়। ইনফেকশনের ধুয়া তুলে যদি পূর্ণ দেহটিকেই দু টুকরো করে দেয়া হয় তবে তো তাতে আর প্রাণের স্পন্দন থাকবে না। ফরজ নামায কিংব ফরজ রোযাকে ঘিরে অনেক জায়গায় নানা রকমের কুসংস্কার প্রচলিত আছে। তাই বলে তো সংস্কারের নামে ফরজ নামায রোযাকে ছেটে ফেলে দেয়া যাবে না। দীনের কাজ করতে হলে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় মাথায় রাখতে হয়। সামনে রাখতে হয় নববী কর্মপন্থা। অতি আবেগ যে কোনো সময় ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে। মাহাত্ম্যপূর্ণ এ রজনী সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা এবং সালাফের কিছ উক্তি রয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনাসহ কয়েকটি বর্ণনা ও আসলাফের কিছু উক্তি এখানে তুলে ধরছি।

(১) মু'আজ ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শা'বানের রজনীতে সৃষ্টিজগতের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং শেরেকে আচ্ছন্ন ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৩৯০, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৫৬৬৫, [শাইখ শু'আইব আরনাউত এর মন্তব্য, হাদীসটির ইসনাদ সহীহ])

উপরোক্ত নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির আলোকে হাদীসটির শাস্ত্রীয় আলোচনায় না গিয়েও এ কথা বলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, হাদীসটি আমলযোগ্য। আমাদের কিছু ভাইয়েরা শাইখ ইবনে বায রহ. এর একটি আলোচনার আলোকে অর্ধ শা'বানের রজনীর মাহাত্ম্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন। কিন্তু ইবনে বায রহ. তাঁর ফাতাওয়াসমগ্রে (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ১/১৮৬, ১/২৩৫ আততাহযীর মিনাল বিদা' অধ্যায়) যে আলোচনাটি করেছেন তাতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং ইবনে রজব হাম্বলী রহ. এর উদ্ধৃতি টেনেছেন। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব অভিমতকে তিনি গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া ইবনে বায রহ. বহু জাল হাদীসের মুণ্ডুপাত করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসটি তাঁর সে আলোচনায় উল্লেখ করেননি। আর কিছু না হোক উপরোক্ত হাদীসটি সামনে থাকলে মহিমান্বিত এ রজনীকে এভাবে তার অপাঙক্তেয় ঘোষণা করার কথা নয়। জানি না, সংশ্লিষ্ট আলোচনাটি করার সময় ইবনে বায রহ. এর 'যেহেনে' উক্ত হাদীসটি ছিল কি না। হয়তো বা তিনি মাত্রাজ্ঞানহীন লোকদের সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির প্রতিকারকল্পে এমন কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তবে এটা তো ইলমে শরীয়তের একটি স্বীকৃত নীতি যে, প্রান্তিকতা বা বাড়াবাড়ির প্রতিকারে বিধিত বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে করা যাবে না; বরং বিধানিক বিষয়ের যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই বাড়াবাড়ির প্রতিকার করতে হবে। এবার আমরা বিশেষ ঘরানার সম্মানিত ভাইদের জ্ঞাতার্থে এ বিষয়ে তাদের কয়েকজন আদর্শ পুরুষসহ কয়েকজন মহামনীষীর মন্তব্য তুলে ধরছি।

১। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, অর্ধ শা'বান রজনীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একাধিক মারফু হাদীস ও আসার বর্ণিত হয়েছে। এসব বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয়, পনের শা'বানের রজনীটি একটি মহিমান্বিত রজনী। সালাফের কেউ কেউ এ রাতে নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শা'বানের রোযার ব্যাপারে তো অসংখ্য হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। সালাফ এবং খালাফের মধ্য হতে কেউ কেউ এ রাতের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করেন। তবে হাম্বলী এবং অহাম্বলী মাসলাকের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ রাতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেন। ইমাম আহমদ রহ. এর ভাষ্যও এ মতের প্রমাণ বহন করে। কারণ এ সম্বন্ধে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর এগুলোর সমর্থনে সালাফের আসারও বিদ্যমান রয়েছে। এ রাতের ফযীলত সম্পর্কিত কতক বর্ণনা মুসনাদ ও সুনান শিরোনামে সংকলিত হাদীস গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। তবে শা'বানের পনের তারিখের দিনে স্বতন্ত্রভাবে রোযা রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া মাকরূহ। (ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অভিমত এটিই। তাঁর মতে পনের তারিখের সাথে দু এক দিন মিলিয়ে রোযা রাখা উত্তম)। আর এ রাতে বিশেষ খাবারের ব্যাবস্থা করা, সাজ-সজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া বিদআত; এর কোনো ভিত্তি নেই। তেমনিভাবে এ রাতে 'সালাতে আলফিয়া' নামক বানোয়াট নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়াও বিদআত। কারণ নির্দিষ্ট সময়, সংখ্যা এবং কিরাতযোগে এ জাতীয় নফল নামাযের জন্য সমবেত হওয়া শরীয়তসম্মত নয়। (ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ১৭/১৭ [শামেলা সংস্করণ])

২। বর্তমান সময়ের আলোচিত ব্যক্তিত্ব শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. উপরোল্লিখিত হাদীসটির সমর্থনে আটটি হাদীস উপস্থাপন করে বলেন, এসব সূত্রের সামগ্রিক বিবেচনায় হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ।...সুতরাং শাইখ কাসেমী রহ. তাঁর ইসলাহুল মাসাজিদ গ্রন্থে (১৭০) জারহ তা'দীলের ইমামদের উদ্ধৃতির আলোকে 'অর্ধ শা'বানের রাতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনো সহীহ হাদীস নেই' বলে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি কেউ এ জাতীয় ঢালাও উক্তি করে থাকেন তবে সেটা তার দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদান এবং সূত্র অনুসন্ধানে কষ্ট স্বীকার করতে না পারার পরিণতি। (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ১/১২৪)

৩। ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. এ রাতের ফযীলত সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, একজন মুমিনের জন্য বাঞ্ছনীয় হলো, এ রাতে যিকির ও দুআ-প্রার্থনার জন্য সম্পূর্ণরূপে অবসর হয়ে যাওয়া। সে নিজের পাপ মার্জনা এবং বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দু'আ-প্রার্থনায় রত হবে। খাঁটি মনে তাওবা করবে। কারণ যে ব্যক্তি এ রাতে তাওবা করে তার তাওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। তবে এক্ষেত্রে মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো, দু'আ কবুল হওয়া ও মাগফিরাত লাভের ক্ষেত্রে যেসব পাপাচার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেসব থেকে বিরত থাকা। (লাতায়িফুল মা'আরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল আমি মিনাল ওয়াযায়িফ ১৯২)

৪। সুনানে তিরমীযীর গাইরে মুকাল্লিদ ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ. এ রাতের ফযীলত সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, এসমস্ত হাদীস ঐসমস্ত ব্যক্তিদের বিপক্ষে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পরিগণিত যারা ধারণা করে, অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলতের ব্যাপারে কোনো কিছুই প্রমাণিত নয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৩৬৭)

৫। মিশকাতুল মাসাবীহ এর সমকালীন ব্যাখ্যাতা আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, ...এসমস্ত হাদীস

অর্ধ শা'বান রজনীর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমার ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এ রাতটি আর পাঁচটা রাতের মত নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে উদাসীন হওয়া উচিৎ নয়। বরং শ্রেয় হল, ইবাদত, দু'আ এবং যিকির-ফিকিরে রত থেকে এ রাতের অফুরন্ত কল্যাণ অর্জন করা। (মির'আতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ ৭/৫৮)

৬। শাইখ ইবনুল হাজ্জ রহ. বলেন, 'এ রাত যদিও শবে কদরের মত নয়; কিন্তু এর অনেক ফযীলত ও বরকত রয়েছে। আমাদের পূর্বসূরী পূণ্যাত্মারা এই রাতের যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং এর যথাযথ হক আদায় করতেন। কিন্তু আজ সাধারণ লোকেরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উল্টো করে ফেলেছে। তারা রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের পেছনে পড়ে (মনের অজান্তেই) এর খায়ের বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একে তো ওরা এ রাতে আলোকসজ্জার নিকৃষ্টতম রসম যা অগ্নিপূজকদের প্রতীক, তা করছে; অপরদিকে মসজিদসমূহে সমবেত হয়ে শোরগোল করে পবিত্র পরিবেশকে নষ্ট করছে। তাছাড়া মহিলাদের কবরস্তানে যাওয়া, তা-ও আবার বেপর্দা অবস্থায়, পাশাপাশি পুরুষদেরও কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ওখানে ভিড় সৃষ্টি করা– এসব কিছুই নব আবিষ্কৃত বিদআত এবং নববী সুন্নত ও সালাফে সালেহীনের পথ ও পদ্ধতির পরিপন্থী।' (আলমাদখাল ১/২৯৯-৩১৩, আলকাউসার, সেপ্টেম্বর '০৬)

৭। প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. বলেন, অর্ধ শা'বান রজনীর অসীম ফযীলত ও মহত্ত্ব রয়েছে। এ রাতে ইবাদতে রত হওয়া মুস্তাহাব। তবে সেটা ব্যক্তি পর্যায়ে; সমবেত রূপ দিয়ে নয়। (আল-আসারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাউযু'আহ ১/৭১)

৮। ইন্টারনেটভিত্তিক ৫৬ হাজার ফতওয়া সম্বলিত আরবী ফতওয়াসমগ্র 'ফাতাওয়া আশশাবাকাতিল ইসলামিয়া'তেও (২/২৫৬৩) এ রাতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ইতিবাচক আলোচনা করা হয়েছে।

অর্ধ শা'বান রজনীর সপক্ষে এত সূত্র ও ভিত্তি থাকার পরও কোন বিবেকে শুধু ইবনে বায রহ. এর একটি বিচ্ছিন্ন মতের আলোকে এ রাতের মহত্ত্বকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার স্পর্ধা দেখানোর সুযোগ থাকতে পারে?

(২) আলা ইবনুল হারিস রহ. সূত্রে বর্ণিত, আয়েশা রাযি. বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন। কিন্তু সেজদাকে এতটা দীর্ঘায়িত করলেন, আমার ধারণা হলো তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে আমি উঠে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃদ্ধাঙ্গুলী নাড়া দিলাম। তখন আঙ্গুল নড়ে উঠল। ফলে আমি যথাস্থানে ফিরে এলাম। যখন তিনি সেজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং যথা নিয়মে নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আয়েশা! তুমি কি ধারণা করেছো, আল্লাহর নবী তোমার অধিকার ক্ষুণ্ন করবেন? তখন আমি বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আপনার দীর্ঘ সেজদার কারণে আমি মনে করেছিলাম, আপনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা হলো, অর্ধ শা'বানের রজনী। আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শা'বানের রজনীতে তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। আবু বকর বাইহাকী রহ. বলেন, এটি উত্তম পর্যায়ের মুরসাল হাদীস। সম্ভবত আলা ইবনুল হারিস মাকহুল থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। (আলজামি' লিশুআবিল ঈমান হাদীস ৩/৩৮২/৩৮৩৫)

এ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়, এ রাতে দীর্ঘ সেজদা সম্বলিত দীর্ঘ নামায আদায় করা শরীয়তের কাঙ্ক্ষিত বিষয়। তবে সাধারণ নিয়মে দু রাকাত, চার রাকাত করে যত রাকাত সম্ভব আদায় করবে। সাথে কুরআন তিলাওয়াত, দুআ-দুরূদ এবং যিকির ইস্তেগফারে মনোযোগী হবে। তবে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন রাত জাগা ক্লান্তির কারণে ফজরের নামাযের অত্যাবশ্যক ইবাদত ছুটে না যায়। আর এসব আমল একান্ত ঘরোয়া পরিবেশেই করা শ্রেয়। তবে যদি কোনোরূপ আহ্বান-ঘোষণা ব্যতিরেকে কিছু লোক মসজিদে এসে যায় এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ আমলে মগ্ন থাকে তবে এতেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, আমার ইবাদতের কারণে যেন অন্যের আমলে কোনোরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

এ মাসের পনের তারিখে রোযা রাখার আমলও করা যেতে পারে। এ দিনের রোযার ব্যাপারে সুনানে ইবনে মাজাহতে (হাদীস নং ১৩৮৮) একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটিকে উলামায়ে মুহাদ্দিসীন সূত্রগত দিক থেকে যয়ীফ বলে অভিহিত করেছেন। তবে এ মাসে অধিক পরিমাণ রোযা রাখার বিষয়টি অসংখ্য সহীহ হাদীসে আলোচিত হয়েছে। উপরন্ত শা'বান মাসের ১৫ তারিখ হলো 'আইয়ামে বীয' তথা চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের অন্তর্ভুক্ত। আর আইয়ামে বীযে রোযা রাখার ব্যাপারটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসের আইয়ামে বীযে রোযা রাখতেন। মিলহান কাইসী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তের চৌদ্দ এবং পনের তারিখে বীযের রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৪৯) আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমার খলীল (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৮১)

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, শা'বান মাসের পনের তারিখে রোযা রাখা নিষিদ্ধ নয়। কারণ পনের তারিখ তো আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রতিমাসে আইয়ামে বীযে রোযা রাখা মুস্তাহাব। (লাতায়িফুল মা'আরিফ ১৮৯)

তবে শুধু ১৫ শা'বানের কারণে এ রোযাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সুন্নত মনে করা অনেক উলামায়ে কেরাম সঠিক মনে করেন না। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার তালিকায় শা'বানের ১৫ তারিখের রোযাকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেন নি। সুতরাং এসকল বিষয়কে সামনে রেখে যদি কেউ এ দিন রোযা রাখে তবে ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব লাভ করবে।

সারকথা, রজব এবং শা'বান দুটি মহিমান্বিত মাস। এ দু'মাসে অধিক পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগী হওয়া শরীয়তের কাঙ্ক্ষিত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ দুটি মাসের স্বাভাবিক মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে সব ধরনের প্রথাগত রীতি-নীতি পরিহার করে প্রভূত কল্যাণ অর্জনের তাওফীক দান করুন এবং সর্বপ্রকার অকল্যাণ-অনাচার থেকে নিরাপদ থেকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন; আমীন!

লেখক : আমীনুত তালীম,মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বছিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

দিক-নির্দেশনামূলক নিবন্ধ

তা'লীম, তাবলীগ, তাযকিয়া : পারস্পরিক সম্পর্ক

মুফতী শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

দীনের দাঈদের পরস্পর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীন ইসলামের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং মুসলমানদের অন্তরে ভাল কাজের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার মনোভাব সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা প্রচেষ্টা চলছে– চাই তা যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন– এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যেমন সন্দেহাতীত তেমনি এগুলোর গুরুত্বও সর্বস্বীকৃত। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ সকল কাজের কর্মীবৃন্দের শুধু নিয়ত ও কর্মপদ্ধতিই ভিন্ন ভিন্ন তা নয় বরং প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও আলাদা ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা ভিন্ন, কর্মকৌশল ভিন্ন, এমনকি প্রত্যেকের নিয়ম-নীতিও ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় দীনী মারকাজ, মাহফিল, আন্দোলন ও সংগঠন এবং মাদরাসাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দীনের বিভিন্ন শাখায় আত্মনিয়োজিত দাঈদের পারস্পরিক আচরণ ও উচ্চারণ কেমন হওয়া উচিত তা জেনে নেয়া দরকার।

তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়া মৌলিক বিষয়

আমাদের মনে রাখতে হবে, কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে আগমনের মৌলিক যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়া অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

অর্থ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত। (সূরা জুমু'আ- ২)

উক্ত কাজগুলোর কোন একটির ব্যাপারেও নির্দিষ্ট করে একথা বলা যাবে না যে, এ কাজটি হচ্ছে মূল ও মূখ্য আর অন্যগুলো ঐচ্ছিক ও গৌণ কিংবা মর্যাদা ও গুরুত্বের বিচারে একটা অগ্রগণ্য আর বাকিগুলো তেমন নয়।

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ও তার মর্যাদা

এ ব্যাপারে এ রকম ফয়সালা দেয়া একেবারেই অসম্ভব। কেননা কোন বস্তুকে অপর বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়া বা একটিকে উত্তম আর অপরটিকে অনুত্তম বলার স্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে উভয় বস্তু সমগোত্রীয় ও অভিন্ন জাতের হওয়া। দুটি বস্তু যদি সমগোত্রীয় না হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন জাত ও প্রকৃতির হয় তাহলে সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তম-অনুত্তমের প্রশ্নই অর্থহীন। মুহিউস্‌সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ. এ ব্যাপারে বড় সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'তুলনা শুধু অভিন্ন জাত ও অভিন্ন প্রকৃতির দুটি বস্তুর মধ্যেই চলে; বিপরীতমুখী দুটি বস্তুর মধ্যে তা চলে না। সুতরাং কেউ যদি প্রশ্ন করে প্রাণীর জন্য চোখ বেশী দরকারী না কি কান বেশী দরকারী? তা হলে বলা হবে স্ব-স্ব স্থানে উভয়টিই দরকারী। এক্ষেত্রে তুলনা করাটাই ভুল। তবে, এটা বলা যেতে পারে যে, উভয় চোখের মধ্যে যে চোখে বেশি ভাল দেখা যায় সে চোখ বেশি ভাল। আর উভয় কানের মধ্যে যে কানে বেশি ভালো শোনা যায় সে কান বেশি ভাল।'

উপরোক্ত উদাহরণের আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কেউ যদি প্রশ্ন করে, তা'লীম, তাযকিয়া ও তাবলীগের মধ্যে কোনটা বেশি দরকারী? তাহলে তার প্রশ্নই সঠিক হবে না। কেননা এগুলোর পত্যেকটিই পৃথক পৃথক বিষয়। আর ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুসমূহের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা চলে না। সুতরাং উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ই জরুরী ও দরকারী। অর্থাৎ স্ব-স্ব স্থানে তা'লীম যেমন জরুরী তাবলীগও তেমন জরুরী আবার তাযকিয়াও জরুরী ।

এই যখন অবস্থা তখন উক্ত তিনটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্ব-স্ব স্থানে সেগুলোর প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম । তাই কোন একটির ব্যাপারেও অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন করা যাবে না। সবগুলোর ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। উপরোক্ত কোন বিষয়ে অবহেলা করা হলে তার জন্য গোটা উম্মতে মুসলিমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

শাখাত্রয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তার উপকারিতা

শাখা তিনটিকে দেখতে পৃথক পৃথক মনে হলেও কার্যতঃ একটি অপরটির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। মানব জীবনে প্রকৃত সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা তখনই আসবে যখন এ কাজ তিনটিতে পরিপূর্ণতা আসবে। এ গুলোর কোন একটি থেকেও যদি চোখ ফিরিয়ে রাখা হয় তাহলে জীবনে অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যাবে। কেননা তা'লীম ও তাবলীগ দ্বারা ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস এবং ইলম ও আমল অস্তিত্বে আসে। আর তাযকিয়া দ্বারা আমলের মধ্যে ইখলাস ও ইহসানের মাধ্যমে কবুলিয়াতের যোগ্যতা আসে। কাজেই এ তিনটি কাজের সমাবেশ ছাড়া মানব জীবনের সফলতা ও কামিয়াবির কল্পনাই করা যায় না। সে হিসেবে এই তিনটির সবগুলো কাজই জরুরি। এমতাবস্থায় প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একথা বলতে হবে যে, এটাও উপকারী ওটাও উপকারী। এগুলোর কোন একটিকে এককভাবে যথেষ্ট মনে করা যাবে না। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিত নিজ নিজ পছন্দ, সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী এ তিনটির কোন একটির প্রচার প্রসারের সঙ্গে নিজেকে ভালোভাবে জড়িত রাখা আর অন্যান্যগুলোর প্রচার প্রসারে সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখা। কেননা এ তিনটির যে শাখাতেই যিনি কাজ করুন না কেন তিনি মূলত দীনেরই কাজ করছেন। দীনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে অপরের সহকর্মী ও সহযোগী। শুধু সমর্থনেই সীমাবদ্ধ না থেকে পরস্পরের দুঃখ-দুর্দশায় শরিক হওয়া ও সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতাও করা চাই। সর্বোপরি একে অপরের খেদমতসমূহের প্রশংসা করা এবং তার কাজের উন্নতি ও অগ্রগামিতায় আনন্দ প্রকাশ করা।

এক্ষেত্রে মুহিউসসুন্নাহ শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ. এর একটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ পৃথক পৃথক কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ নিজের শরীরের কোন অঙ্গকে তুচ্ছ মনে করে না। অঙ্গসমূহের পৃথক পৃথক কাজের কোনো তুলনাও করে না। এমন কি এক অঙ্গকে অপর অঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বীও মনে করে না। এমনিভাবে দীন ইসলামও একটি দেহ সদৃশ। তার বিভিন্ন অংশ আছে। কেউ মাদ্রাসায় তা'লীম তরবিয়াতের কাজ করছে , কেউ তাবলীগ করছে, আবার কেউ খানকায় আত্মশুদ্ধির কাজ করছে। এমতাবস্থায় দীনের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে অপরকে তুচ্ছ বা হেয়জ্ঞান করে কিভাবে? তাছাড়া পরস্পরের কাজের তুলনা করা বা একে

অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বীই বা মনে করা সুযোগ কোথায়! একারণেই দেখা যায়, পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরামগণ দীনের সব ধরনের খাদেমদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। এটা আল্লাহ তা'আলারই নির্দেশ। ইরশাদ করেন,

تعاونوا علي البر والتقوى

অর্থ : তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। সুতরাং একে অপরকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে। 'আমাদের' ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে; 'আমাদের' মাদরাসা চলছে, 'আমাদের' দল আগে বাড়ুক; এগুলো কি ধরনের কথা!? দীনকে সামনে রাখুন। নিজেকে পেশ করবেন না। কারো বয়ান দ্বারা যদি সমাজের ব্যাপক উপকার হয় বা কোন মাদরাসা দ্বারা যদি দীনের উপকার হয় তাহলে হিংসা বা আত্মপীড়নের কী আছে?' (মাজালিসে আবরার; পৃষ্ঠা ৮৪)

উপরোক্ত কথাটিকে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'দীনের এবং মাদরাসার প্রত্যেক খাদেমের উচিত দীনের অন্যান্য শাখার খাদেমদেরকে নিজেদের সহকর্মী ও সহযোগী মনে করা। যেমন রেলওয়ে বিভাগে রেলের টিকিট বিক্রেতা, গার্ড, টি.টি ও সিগন্যালম্যান– এরা প্রত্যেকেই একে অপরকে রেলওয়ে বিভাগের চাকুরীজীবী ও কর্মকর্তা মনে করে এবং একে অপরকে সহকর্মী ও সহযোগী মনে করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুযোগ সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখে। মনে রাখবেন, পারস্পরিক তুলনা ও শ্রেষ্ঠত্বদান থেকেই হিংসা-প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। মোটকথা দীনের দাঈ ও মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরামগণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাজের পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যবিবরণী প্রচার করতে পারেন। কিন্তু অন্যের সাথে নিজেদের তুলনা করতে পারেন না। কারণ এতে দীনের অন্যান্য খাদেমদের হেয় জ্ঞান করা হয়। ফলে পরস্পরে দূরত্ব ও বৈরিতা বাড়তে থাকে এবং হিংসার মতো মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। (মাজালিসে আবরার; পৃষ্ঠা ২৪৩)

নাযুক পরিস্থিতি

বর্তমান যামানায় দীনী আন্দোলন ও সংগঠন এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বড় অদ্ভূত। পরস্পরে হামদর্দী ও সহানুভূতির পরিবর্তে নিজের গর্ব-গৌরব প্রচার করা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অচেনা ভাব করা, একে অন্যের খায়েরখাহি ও কল্যাণকামিতার পরিবর্তে অনিষ্ট ও অকল্যাণ কামনা করা, দীনের যে কাজের সাথে নিজে সম্পৃক্ত সেটাকেই দীনের একমাত্র কাজ মনে করা এবং দীনের অন্যান্য কাজকে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করার যে মনোভাব ও মনোবৃত্তি সর্বত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে তা বড়ই বিপদজনক এবং এর পরিণতিও বড় ভয়াবহ। আজ বাতিল যেখানে বিভিন্ন আকৃতি ও অবয়বে শুধু আত্মপ্রকাশ করছে তা-ই নয় বরং সমস্ত কুফরি শক্তি এক প্লাটফর্মে জমা হয়ে ইসলামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কুরআনের ভাষায়, مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ অর্থাৎ 'প্রত্যেক উঁচু ভূমি হতে তারা দ্রুত ছুটে আসছে।'

এমন নাযুকতম পরিস্থিতিতে আহলে হকের ঝাণ্ডাবাহী কর্মীদের এ অবস্থা বিদ্যমান থাকা খুবই পরিতাপের বিষয়। উচিত ছিল আপোসে মুহাব্বত ও ভালোবাসার আবহ গড়ে তোলা; যাতে পরস্পরে সম্পর্ক ভালো থাকে। কখনো কখনো অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হলে উদারতা, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিবে। আপোসে মীমাংসার পথ অবলম্বন করে মনের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনবে। تعاونوا علي البر والتقوى এর ভিত্তিতে সর্বত্র নেক কাজে সাহায্য-সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলবে। এ প্রসঙ্গে নিকট অতীতের দুজন দাঈর মূল্যবান কিছু বাণী উল্লেখ করা হলো-

সময়ের বড় মহামারী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শক্তিশালী মুখপাত্র ও নির্ভীক সৈনিক আল্লামা মনযুর নোমানী রহ. বলেন, 'এ কাজ (দাওয়াত ও তাবলীগ) ছাড়াও দীনের আরো অনেক কাজ ও শাখা আছে। যেমন: মক্তব মাদরাসা ও দীনী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। অন্তর থেকেই সেগুলোকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা চাই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য আমাদের অন্তরে হামদর্দী ও সহানুভূতি থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলার যে সব বান্দাগণ ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে এসব বিষয়ে নিজেদের শ্রম ও কুরবানী পেশ করে যাচ্ছেন সেসব বান্দাদেরকে যথাযথ ভক্তি-শ্রদ্ধা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ না করুন! আমাদের কাজকেই যদি দীনের একমাত্র কাজ মনে করি আর দীনের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টি হয় তাহলে এটা হবে আমাদের গোমরাহি ও বদনসীবি। বরং দীনের দাবীতে বদদীনীর বিস্তার হবে। নিজেদেরকে হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কেরাম ও আহলুল্লাহদের খাদেম ও অনুগত ভৃত্য মনে করবে। তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে তাদের খেদমতে হাজির হবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখাকে নিজের জন্য আবশ্যক মনে করবে।' (মাসিক আল ফুরকান; ভলি. ১৯, পৃ. ৭)

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন ,'আমাদের আরও একটি নিয়ম হল, এই কাজ (দাওয়াত ও তাবলীগ) ছাড়া আহলে হকের অন্যান্য যে সব কাজ, দীনী সংগঠন, আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবন্ধক মনে করা যাবে না। বরং সেগুলোরও যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেগুলোর উপকারিতা ও অগ্রগামিতার জন্য সর্বোপরি সব ধরনের অনিষ্ট ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ ও রোনাজারি করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে দীনের প্রতিটি কাজই জরুরি। বর্তমানে দীনের প্রয়োজনীয়তা এত বেড়ে গিয়েছে এবং এর পরিধি এত বিস্তৃত হয়েছে যে, এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান , কোন দল বা আন্দোলন সে প্রয়োজন পুরা করতে পারবে না। চিন্তা করে দেখুন! এই যে আমাদের হাজার হাজার মক্তব মাদরাসা, যেগুলোতে দীনের তা'লীমের কাজ হচ্ছে, হক্কানী পীর-মাশায়েখদের মাধ্যমে যিকির-আযকারের যে পরিবেশ তৈরী হয়েছে, সর্বোপরি আহলে হকের বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠান দীনের জন্য এবং মুসলমানদের ঈমান-আমল হেফাজতের জন্য যেসব কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন সেসব কাজ যদি তারা বন্ধ করে দেন তাহলে যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে এবং সমাজ ও ইসলামী দুনিয়ায় যে ভয়াবহ অন্ধকার নেমে আসবে তা সামাল দেয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

'দীনের অপরাপর আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের খেদমত ও অবদান স্বীকার না করা, সেগুলোকে যথার্থ মূল্যায়ন না করা এবং সামান্য মতানৈক্যের কারণে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। আর শয়তানও এ কাজে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে উক্ত মনোভাব সৃষ্টি করে উম্মতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই একে অপরের দোষচর্চায় মেতে উঠেছে। কিন্তু অপরপক্ষের কোন গুণ ও অবদান তাদের চোখে পড়ছে না, ফলে গুণ অবদানের আলোচনাও হচ্ছে না। মোটকথা, আমাদের এই দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের নীতি হল, 'আমরা দীনী সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করব। আমরা যেহেতু বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে দীনের আরও বহু কাজে নিজেরা শরীক হতে পারছি না তাই যারা ঐ কাজগুলো আঞ্জাম দিচ্ছেন তাদের ইহসান ও অনুগ্রহ স্বীকার করে নেব যে, তারা নিজ দায়িত্বে আমাদের না করা কাজটির

দেখভাল করছেন। সর্বোপরি তাদের সাফল্যের জন্যও আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করব।' (মাসিক আল ফুরকান; ভলি. ২০, পৃ. ৩, ৪, ৫)

দীনী আন্দোলনের কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের পরস্পরে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. বলেন,'আমাদের এই আন্দোলনের (দাওয়াত ও তাবলীগ) সমসাময়িক অন্যান্য আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানগুলো যদি 'বাণীনির্ভর' বিষয়গুলোকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে ইখলাসের সাথে কাজ করে তাহলে আমাদের উচিত তাদের সাথে ইখতিলাফ না করা। বরং তাদের কাজকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও স্বীকৃতি দেয়া উচিত। সাথে সাথে তাদের জন্য দু'আ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা। কারণ তারা দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামাল দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় নিজেদের কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

হযরতজী ইলিয়াস রহ. দীনী মাদরাসাগুলোর জন্য খুব দোআ করতেন এবং নিজের বিশেষ ভক্তবৃন্দকে মাদরাসাগুলোতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এমন বহু মাদরাসা আছে তাবলীগী আন্দোলনের কারণে সেগুলোর আয় বেড়ে গিয়েছিল। তিনি তার মুহিব্বীনদেরকে এ বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন যে, তারা যেন সময় করে উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তাদের সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখে এবং তাদের হক (ভক্তি, শ্রদ্ধা, সাহায্য ও ভালবাসা) আদায় করে।

'আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মানুষের মাঝে স্তর ও শ্রেণীগত এতো পার্থক্য এবং চিন্তা-চেতনায় এতো বৈপরীত্য রয়েছে যে, কোন দল বা সংগঠন কিছুতেই এ দাবি করতে পারবে না যে, তারা প্রত্যেক স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করতে, তাদের জন্য শান্তির ব্যবস্থা করতে, সর্বোপরি তাদের যোগ্যতা অনুসারে আত্মার খোরাক যোগান দিতে সক্ষম। কারণ কেউ ওয়াজ-নসীহত দ্বারা ভাবিত হয়, কেউ প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়ে প্রভাবিত হয়। আবার কেউ অন্য কোন ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। সব জায়গায়, সব পরিস্থিতিতে এবং সব পরিবেশে শুধু একটিমাত্র কর্মপদ্ধতি দ্বারা সাফল্য অর্জন অসম্ভব। এ বাস্তব সত্যটি বুঝতে অনেকেই ভুল করে।

'সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের অনেকে আছেন, যারা কারো প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাঁদের অবলম্বিত বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করে। সবাই একই কাজ করতে থাকবে আবার ইনকিলাব ও পরিবর্তন সাধিত হবে এটা হয় না। এ জন্য প্রতিটি বস্তুকে তার যথাস্থানে রাখতে হবে এবং সেগুলো থেকে যথাযথ কাজ নিতে হবে।

'যে যে কাজে যোগ্য ও পারদর্শী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, উপরন্তু কাজটি অন্যদের তুলনায় সে-ই ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম তাহলে তাকে দিয়ে ঐ কাজটিই করাতে হবে। এটাই নিয়ম। তাই দীনের অন্যান্য কাজ ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ তারা অনেক মানুষকে দীনের জ্ঞান দিয়ে সেবা করে যাচ্ছেন, যা আমাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। এসবকে আল্লাহ তা'আলার গায়েবী ব্যবস্থাপনা মনে করা উচিত যে, কিছু লোক এই পদ্ধতিতে দীনের পথে আসছে। আর কিছু লোক আসছে অন্য কোনো পদ্ধতিতে।' (মাসিক আল ফুরকান; ভলি. ২০, পৃ. ৩, ৪, ৫)

(আলোচ্য বিষয়ে মুসলিম জাহানের মুরুব্বী, শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানী দা.বা.-এর কিছু কথা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। ১৪২১ হিজরীর ২২শে শাওয়াল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকার বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে তিনি এ বয়ানটি করেছিলেন। অনুবাদক।)

তিনি বলেন, 'উম্মতে মুসলিমাকে আজ চতুর্মুখী ফিতনা ঘিরে রেখেছে। ফিতনার যেন তুফান বয়ে চলছে কিংবা মুষলধারে বর্ষণ চলছে। এই চতুর্মুখী ঝড়-তুফানের মোকাবেলা করা কোনো এক জামাআতের পক্ষে সম্ভব নয়। একেকটি জামাআতকে এখন একেকটি ফেতনার মোকাবেলায় শক্তভাবে দাঁড়ানো উচিত এবং জান-মাল, চিন্তা-ভাবনা ও শক্তি-সাধনা সেই কাজেই পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা উচিত। কাজের পথ ও পন্থা ভিন্ন হতে পারে এবং ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য দীনী মেহনতের প্রতিও হামদর্দী ও সহানুভূতি থাকতে হবে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক জামাআত ও দল যদি আচরণ-উচ্চারণে একথা বোঝায় যে, এটাই দীনের একমাত্র কাজ এবং এটাই একমাত্র কর্মপন্থা কাজেই সবার এটাই করা উচিত, তাহলে এটা হবে গুরুতর ভুল। কেননা আসল উদ্দেশ্য দীনের খেদমত। আর কোন মানুষ যদি ইখলাসের সাথে দীনের কোন খেদমতে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বরং দু'আ ও সাধ্য মতো তাকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু উদার মানসিকতা ও সহমর্মিতা আমাদের মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। এটা বহু রকম সমস্যা সৃষ্টি করে এবং দীনের বড় বড় ক্ষতি সাধন করে। এতে উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে অযথা ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

দীনের দাঈদের জন্য উপকারী কয়েকটি পরামর্শ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হলে দীনের দাঈদের পারস্পরিক মুহাব্বত ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট থাকবে ইনশাআল্লাহ।

(১) ইহতিমাম ও গুরুত্ব দিয়ে একে অন্যের কল্যাণ ও কামিয়াবির জন্য দু'আ করা এবং পরস্পরে একে অন্যের নিকট দু'আর দরখাস্ত করা। এতে লাভ এই হবে যে, প্রত্যেকেই অপরকে নিজের জন্য দু'আকারী মনে করবে। এভাবেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব হৃদ্যতা গড়ে উঠবে। একের প্রতি অপরের ভুল বোঝাবুঝি ও বদ ধারণা দূর করতে হবে। এর উত্তম পদ্ধতি মুহিউসসুন্নাহ শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ. এর ভাষায় এ রকম-

'আকাবিরদের দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে একটি পদ্ধতি ঢেলে দিয়েছেন যে, মাদরাসার শুভাকাঙ্ক্ষীরা শুধু নিজেদের মাদরাসার জন্যই দু'আ করবে না বরং এভাবে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! যারা দীনের কাজ করছে, চাই তাবলীগের হোক বা মাদরাসার হোক অথবা তাযকিয়ার মাধ্যমে হোক, সবাইকে তুমি সঠিক পথ ও পন্থায় ইখলাসের সাথে কাজ করার তাওফীক দান কর। তাদের খেদমতকে তুমি কবুল কর এবং দীনের সমস্ত দাঈকে সুস্থতা, সামর্থ্য ও ইখলাস দান কর।'

(২) কারো কোনো ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেলে আপোসে বা বৈঠকে আলোচনা-সমালোচনা না করে বরং হামদর্দী ও সহানুভূতির সাথে তা সংশোধনের চেষ্টা করা। অথবা যাদের দ্বারা সংশোধন সম্ভব তাদেরকে অবহিত করা।

(৩) সময়-সুযোগ মত পরস্পরে মিলিত হয়ে একে অপরের কাজের খোঁজ নেয়া। কাজের উন্নতি ও অগ্রগামিতায় আনন্দ প্রকাশ করা। কোন সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করা এবং সুপরামর্শ দেয়া।

(৪) নিজ নিজ মহল্লার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। যেখানে যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয় সে কাজের যোগ্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করা।

(৫) নিজেদের কাজের পরিচিতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য এমনভাবে উৎসাহ দেয়া যাতে দীনের অন্যান্য কাজের সাথে তুলনা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না হয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিয়ে উদার মনোভাবের প্রকাশ ঘটাতে হবে।

(মাওলানা ইফজালুর রহমান হারদুয়ী দা.বা. লিখিত 'তালীম, তাবলীগ, তাযকিয়া : বা-হামী রবত' শীর্ষক লেখা অবলম্বনে)

বড়দের বয়ান

দীনী মাদরাসা থেকে শিক্ষাসমাপনকারী নবীন উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে...

মূল : আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী রহ.

অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসঊদ

হযরতুল আল্লাম আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা থেকে শিক্ষাসমাপনকারী তালিবে ইলমদের সামনে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায়, আলেমানা আন্দাযে উপদেশমূলক এ 'বিদায়ী ভাষণ'-টি ৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রদান করেছিলেন। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার বার্ষিক সম্মেলন-২০১৫ উপলক্ষে সময়োপযোগী বিবেচনায় তার অনুবাদ প্রকাশ করা হল।
–সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর,
প্রিয় সন্তানেরা!
আমি এই মজলিসের জন্য এবং এখান থেকে শিক্ষাসমাপনকারীদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন পয়গাম এবং নিজ অধ্যয়ন, জ্ঞান, ইলমী অভিরুচি ও অনুসন্ধানে এর চেয়ে উত্তম কোন উপদেশ পাই না, যা নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওয়ানাকারী সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলতেন,

أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك

'আমি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার কর্মের শুভ পরিণাম।'

উপর্যুক্ত শব্দাবলীর মধ্যে 'আমানত' শব্দটির ভাব ও মর্ম কোন একক শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হৃদয়ের জাগৃতি, দায়িত্বের অনুভূতি, অনুভূতির লালন-পালন, খোদাভীরুতা, মানবপ্রেম, খোদায়ী বিধানাবলীর মর্যাদা রক্ষা এবং তার ওপর আমল– এই সমস্ত বিষয় ওই এক আমানত শব্দে গচ্ছিত রয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

অর্থ: আমি এ আমানত(-ভার) পেশ করেছিলাম আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে। তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল ও তাতে শঙ্কিত হল আর তা বহন করে নিল মানুষ। বস্তুত সে ঘোর জালেম, ঘোর অজ্ঞ। (সূরা আহযাব:৭২)

প্রিয় বৎসগণ!
আপনারা এই তিনটি অমূল্য রত্ন আঁচলে বেঁধে নিন, বরং হৃদয়-ফলকে এঁকে নিন। দীন, আমানত এবং শুভ পরিণামের মধ্যে শেষটির দায়িত্ব আপনাদের যিম্মায় ততোটা নয়, যতোটা বর্তায় প্রথম দুটি। শুভ পরিণাম তো আল্লাহ তা'আলার হাতে। তবে এর জন্যও কিছু উপায়-উপকরণ আছে এবং কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শুভ পরিণাম অর্জনের জন্য যে উপায়-উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে তা হল, আপনাদের কর্মপন্থা ও আকীদা-বিশ্বাস। কর্ম, কর্মপন্থা আর আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হলে আল্লাহর পক্ষ হতে আপনাদের জন্য শুভ পরিণামের ফায়সালা হয়ে যাবে। অর্থাৎ দান তো আল্লাহ তা'আলাই করবেন তবে আপনাদেরকে সে সব গুণাবলী অর্জন করতে হবে যার ওপর শুভ পরিণাম নির্ভর করে।

স্বীয় মর্যাদা উন্নত করুন

আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ইশারা-ইঙ্গিতের নয়; খোলামেলা ও লৌকিকতামুক্ত। তাই স্পষ্ট করেই বলছি– আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দী করুন। নফলসমূহ ও দৈনন্দিনের তাসবীহাতের ইহতিমাম করুন। যেন বোঝা যায়, আপনারা কোন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে এসেছেন। মসজিদে গমন থেকে শুরু করে সমস্ত কাজে সাওয়াবের নিয়ত করুন। এটা এজন্য বললাম যে, আপনাদের সামনে জীবনের যে সব অজানা মনযিল ও কঠিন-জটিল পরীক্ষা আসছে এবং এই দেশ বরং মুসলিম উম্মাহ যে পথে হাঁটছে, উপরন্তু জীবিকা নির্বাহের বোঝা, পরিবার-পরিজনের দেখভাল এবং আত্মিক রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ– এই সব কিছু নামায আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এবং নামায থেকে মনোযোগ হটিয়ে দিতে পারে। তবে নামাযের চেয়েও বেশি গুরুত্বের দাবী রাখে তাওহীদী আকীদা-বিশ্বাস। আপনাদের আকীদা-বিশ্বাস হবে নির্ভেজাল খাঁটি তাওহীদ। এ ব্যাপারে 'মাসলাকে ওয়ালীউল্লাহ' আপনাদের মানদণ্ড আর শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর কিতাব 'তাকবিয়াতুল ঈমান' হল সংবিধান। মূলত এই আকীদা-বিশ্বাসের ওপরই আমাদের জামাআতের ভিত্তি-বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান সময়ে কমপক্ষে ভারতবর্ষে বরং আমার ধারণা এশিয়া এবং সমগ্র প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে যে চিন্তাধারা সর্বাপেক্ষা গভীর ও ইলমী বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামের সঠিক ও সামগ্রিক রূপ উপস্থাপনকারী হিসেবে ও সবচে' উপকারী, আমলযোগ্য এবং সময়ের বিচারে সবচে' সজীব ও শক্তিশালী হিসেবে শাহ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাদর্শন অপেক্ষা উন্নত ও উত্তম কোন চিন্তাদর্শন নেই। আপনারা তার রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ অধ্যয়ন করে দেখুন, এতে ইবাদাত-বন্দেগীর কেমন সুন্দর ও সুসংহত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমার রচিত তারীখে দাওয়াত ও আযীমতের শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. সংশ্লিষ্ট অংশটিও গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করুন। বুঝতে পারবেন, শাহ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাদর্শনের চেয়ে অগ্রগামী, বিশ্বজনীন, গবেষণা সমৃদ্ধ ও বাস্তবনির্ভর কোন সংস্কার ও সংশোধনধর্মী এবং দাওয়াতী রচনাবলী শুধু ভারতবর্ষেই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বেও তার নজির নেই। আপনারা এ চিন্তাদর্শন হৃদয়ে লালন করবেন এবং জীবনে সংবিধানরূপে গ্রহণ করবেন।

দুনিয়া বিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যে...

আপনারা দুনিয়া বিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যে, বড় বড় রাজ্য ও রাজ্যের অধিকর্তারা আপনাদেরকে ক্রয় করতে সক্ষম না হয়। দীনে ইসলাম আজ পর্যন্ত টিকে থাকার এটাই মূল রহস্য যে, হক্কানী রব্বানী উলামায়ে কেরামকে আজ পর্যন্ত কেউ খরিদ করতে পারে নি। শায়খ সাঈদ হালাবী রহ. এর ঘটনা তো অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তিনি জামে উমাবীতে

তালিবে ইলমদের দরস দিচ্ছিলেন। অসুবিধাজনিত কারণে পা দুটো প্রসারিত করে রেখেছিলেন। ইতোমধ্যে সিরিয়ার গভর্নর– যে কি না বড় রক্তপিপাসু ও স্বৈরাচারী শাসনকর্তা হিসেবে মশহুর ছিল এবং মামুলী সব অপরাধে মানুষের গর্দান নামিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না– সৈন্য-সামন্তসহ আগমন করল। গভর্নর এসে দরসের অদূরে দাঁড়িয়ে শায়খকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। শায়খ তার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে আগের মতোই পা ছড়িয়ে নিজ কাজে ব্যস্ত রইলেন। অবস্থাদৃষ্টে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাপড় গোটানো শুরু করল যে, না জানি এক্ষুণি উস্তাদজীর গর্দান উড়ে যায় আর তাঁর রক্ত ছিটকে এসে তাদের জামা-কাপড় রঞ্জিত হয়। গভর্নর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে মসজিদ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করল এবং ফিরে গিয়ে শায়খের জন্য এক থলে স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া পাঠাল। শায়খ সাঈদ হালাবী একথা বলে সেই রাজকীয় উপঢৌকন ফেরত পাঠালেন যে,

سلم على مولاك وقل له من يمد رجله لايمد يده

'আপনার মুনিবকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, যে ব্যক্তি পা ছড়িয়ে রাখে সে কখনো হাত প্রসারিত করে না।'

খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রহ. সম্পর্কেও এ জাতীয় একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। একবার শীতকালে খাজা সাহেবের রোদ পোহানোর প্রয়োজন হল। তিনি রাস্তার ধারে পথের দিকে পা ছড়িয়ে বসে ছিলেন। জানা গেল, সে সময় বাদশাহর সওয়ারী ওদিক দিয়ে অতিক্রম করবে। লোকেরা আরয করল, জনাব! এক্ষুণি এ পথ দিয়ে বাদশাহর সওয়ারীবহর অতিক্রম করবে, পা'টি একটু গুটিয়ে নিলে ভালো হয়! হিতাকাঙ্ক্ষীদের এ পরামর্শ শোনে তিনি বড় আশ্চর্যকর একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, 'যে ব্যক্তি হাত গুটিয়ে রাখে তার আর পা গোটানোর প্রয়োজন নেই।' অর্থাৎ যে বাদশাহর সাহায্য থেকে বিমুখ হয় এবং তার দান-দক্ষিণা গ্রহণ করে না, তার জন্য পা গোটানোর দরকার পড়ে না।

কাজেই আপনারা নিজেদেরকে শতভাগ স্বাধীন রাখবেন। কোন শাসনযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা এবং কোন বিত্তশালীর নজর থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখবেন। বর্তমানে একটি সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, আরবী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ চাকুরীর সন্ধানে উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশেষ করে সৌদি আরবে পাড়ি জমাচ্ছে। আমি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলছি, এই উম্মতের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং সময়ের সর্বাপেক্ষা বড় জিহাদ হল, আপনারা আরব রাষ্ট্রসমূহে দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে গমন করুন, যেখান থেকে আমরা ঈমানের দৌলত লাভ করেছি। আপনারা আরবদেরকে তাদের গুরুদায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিন। এতে আপনাদের আরবী পড়ার ঋণ শোধ হবে এবং আল্লাহর কাছেও আপনারা মূল্যায়ন পাবেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখান থেকে এমন এমন লিটারেচার প্রকাশিত হয়েছে, যা সেখানে আমাদের আওয়াজ পৌঁছে দিয়েছে। আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রভাব উদ্দীপক ও শক্তিশালী আওয়াজ নাদওয়াতুল উলামা থেকেই উচ্চকিত হয়েছে।

ভেতরটাকে রাখুন মুক্ত-স্বাধীন

প্রিয় বন্ধুগণ!

আপন হৃদয়টাকে মুক্ত-স্বাধীন রাখুন এবং রাখুন শরীরটাকেও। আজকাল বড় একটা আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। আশঙ্কাটা হল, ইমাম মুয়াযযিনগণের বেতন-ভাতা নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকারীভাবে তাদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবী জানানো হচ্ছে। এর অনিবার্য পরিণতি হল, নির্বাচনের সময় ইমামদের দ্বারা কাজ নেয়া হবে, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের বিরুদ্ধে কাজ করানো হবে। কারণ মসজিদগুলো যখন রাষ্ট্রীয় ওয়াকফ অধিদপ্তরের আয়ত্ত্বাধীন হবে এবং ইমামগণ সরকারী কর্মচারী সাব্যস্ত হবেন তখন এমন চাকুরে ইমামগণ মসজিদের মিম্বর থেকে স্বাধীনভাবে দীনের কথা বলতে পারবেন না। এজন্য আপনারা নিজেদের দীনের হেফাজত করুন– আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকেও, আমল-আখলাকের দিক থেকেও; নফলের দিক থেকেও, ফরযের দিক থেকেও।

'তোমার আমানত'

আমানত কথাটির মর্ম হল, জাতির পক্ষ থেকে, আল্লাহ এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে আপনাদের ওপর কী কী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে; জাতি কোন বিপদে নিপতিত হয়েছে এবং কোন কাঁটাময় উপত্যকা তারা অতিক্রম করছে সেদিকে আপনাদের সজাগ দৃষ্টি রাখা। আজ মুসলিম পার্সোনাল ল' উঠিয়ে দেয়ার জন্য কতোভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। মুশরিকানা শিক্ষানীতির মাধ্যমে জবরদস্তিমূলক নতুন প্রজন্মকে নতুন ধাঁচে গড়ার জীবনপণ চেষ্টা করা হচ্ছে। সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মুসলমান শুধু নামকাওয়াস্তে বাকি থাকবে সবখানে এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাদের এ দেশকে স্পেন বানানোর ভয়াবহ রকম পাঁয়তারা চলছে।

বন্ধুগণ!

আপনাদেরকে সমাজ সংশোধনের কাজেও আত্মনিয়োগ করতে হবে। এটাও 'তোমার দীন' কথাটির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে জাহেলী রসম-রেওয়াজ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পদপূজা এতোটাই বেড়ে গেছে যে, তুচ্ছ ও মামুলী জিনিসের জন্য মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে। আপনাদেরকে এই সয়লাবের বিপরীতে উল্টো স্রোত সৃষ্টি করতে হবে বরং এক্ষেত্রে আপনাদেরকে চালকের আসন গ্রহণ করতে হবে। তারপর সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব থেকেও ভারতবর্ষের মুসলিম মিল্লাতকে আপনাদেরকেই হেফাজত করতে হবে; কৃষ্টি-কালচারের দিক থেকেও, ভাষা-সাহিত্যের দিক থেকেও। যদি আপনারা কুরবানী পেশ করতে পারেন, দুনিয়া বিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করতে পারেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সাহায্য করবেন; এই দীন তার সকল বৈশিষ্ট্যসহ বেঁচে থাকবে। দীনে ইসলাম তো চিরদিন বেঁচে থাকার জন্যই এসেছে। বর্তমানে ইয়াহুদীবাদ, খ্রিস্টবাদ, হিন্দুমত ও বৌদ্ধমতসহ সকল মতবাদ শুধু বদলেই যায়নি, এগুলোর মূল আকৃতিও এমন বিগড়ে গেছে যে, চেনাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সুদীর্ঘকাল যাবত এ সকল ধর্মমতের ওপর সংস্কার ও সংশোধনের কোন আঁচড় লাগেনি, ফলে স্বভাবতই এগুলো বিলুপ্তির শিকার হয়েছে। শুধু এবং শুধুমাত্র ইসলামই তার আত্মা ও আকৃতিসহ আজ পর্যন্ত সগৌরবে বেঁচে আছে। নফল থেকে নিয়ে ফরয পর্যন্ত, সুন্নাত থেকে নিয়ে মুস্তাহাব পর্যন্ত, আখলাক থেকে নিয়ে লেনদেন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি পর্যন্ত জীবনের সকল ময়দান ও মনযিলে ইসলাম টিকে আছে আপন মহিমায়। কুরআন বিদ্যমান আছে, কুরআনের ভাষা বিদ্যমান আছে, কুরআনের এক একটি অক্ষর এমনকি তার স্বরচিহ্ন পর্যন্ত বিদ্যমান ও বাকি আছে। এর মৌলিক কারণ তো এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, إِنَّ
اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ এবং الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই।' এবং 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।'

আর দ্বিতীয় কারণ হল, সংস্কারক ও সংশোধনকারীদের ক্রমধারা, যা এই উম্মতের ইতিহাসে কখনো হাতছাড়া হয়নি। একমাত্র ইসলামেরই এই সৌভাগ্য হয়েছে যে, তার কোন শতাব্দী ও কোন রাষ্ট্র সংস্কারক বিহিন দিন কাটায়নি। আমাদের পক্ষে এর শতভাগ বিবরণ সংগ্রহ করা তো সম্ভব নয়, তবে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন, উত্থান, বিস্তার ও প্রতিটি শতাব্দীতে তার সংস্কার-সংশোনের বিস্তারিত বিবরণ কিতাবের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর আমার লিখিত তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত (বাংলা অনুবাদ: সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) কিতাবে অন্যান্য ভূ-খণ্ডের দীনী সংস্কারকদের আলোচনাও এসেছে।

এ ইলমী মায়ের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখুন

পরিশেষে আপনাদের কাছে আমার দাবী, নাদওয়াতুল উলামা আপনাদের ইলমী মা; আপনারা এর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। এমন অনেকেই আছেন যারা শিক্ষা সমাপনের পর আর কখনও এখানে পা ফেলেন না, দ্বিতীয়বার আর তাদের চেহারা দেখা যায় না। জানা নেই, তাদের কী হয়েছে বা কোন অবস্থায় তারা দিন গুজরান করছে। এর সঙ্গে আরেকটি কথাও বলতে চাই, তা হল– নিজেদের অধ্যয়ন ও গবেষণা অব্যাহত রাখুন। জ্ঞানের সফর তো কখনও শেষ হয় না। জ্ঞান সদা-সর্বদা সতেজ ও সজীব হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তার উন্নতি ও পরিমার্জনও হয়ে থাকে। আপনারা নাদওয়ার মুখপত্র আল বা'স, আর রায়েদ এবং তামীরে হায়াত পাঠ করবেন। মাশাআল্লাহ দারুল মুসান্নেফীন, মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়্যাতে ইসলাম অনেক মানসম্পন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রস্তুত করেছে, আপনারা সেগুলোও পাঠ করবেন এবং তা থেকে উপকৃত হবেন। সময়ের দাবী উপলব্ধি করা, উম্মতের সমস্যাবলী নির্ণয় করা এবং তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করা নাদওয়াতুল উলামার নিয়মিত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো সেই বীজ যা আলেমে রব্বানী মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এর হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি যেহেতু খ্রিস্টবাদের খণ্ডনে বাহাস-বিতর্কও করতেন এ থেকে অনুমান করা যায়, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা এবং ইংরেজ লেখকদের রচনাশৈলী সম্পর্কে অবহিত থাকাও জরুরী। যেহেতু (অমুসলিম) প্রাচ্যবিদগণ একটি বিশেষ লক্ষ্যে কাজ করছে এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও চাতুর্যের সঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষিত ব্যক্তি-বর্গের মন-মানস প্রভাবিত করে চলছে। বলাবাহুল্য রাষ্ট্রক্ষমতার চাবিকাঠি একসময় এসব লোকের হাতেই তুলে দেয়া হয়। আরব বিশ্বে বর্তমানে ঐ শ্রেণিটিই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যারা ইউরোপ-আমেরিকা থেকে শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে এসেছে। কাজেই অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনাদেরকে এর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এমন সব রচনাবলী প্রস্তুত করতে হবে যা এ জাতীয় শিক্ষিতজনের মন-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং ইসলাম কর্তৃক সর্বকালেই মানবগোষ্ঠির নেতৃত্বদানের সক্ষমতার বিশ্বাস তাদের দিল-দেমাগে বসে যায়। মোটকথা এই দলটিকে আশ্বস্ত করার দায়িত্বও আপনাদের। মানবসমাজের সার্বিক অবস্থা ও তাদের চিন্তা-ভাবনার মোড় পরিবর্তনের সার্বক্ষণিক নজরদারীও নাদাবী উলামায়ে কেরামের গুরু দায়িত্ব। আপনাদের জানা থাকতে হবে, সমাজের কোন শ্রেণিটি কোন ভাষায় কথা বললে বোঝে, কোন ধরণের দলীল-প্রমাণ সাদরে গ্রহণ করে এবং কোন পদ্ধতির আলোচনা সহজে মেনে নেয়। আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত সকলকে এসব যিম্মাদারীর সঠিক অনুভূতি দান করুন এবং তা বাস্তবায়নের সকল আসবাব ইন্তিযাম করে দিন। আ-মীন।

(সংগ্রহ: খুতুবাতে আলী মিয়াঁ রহ. ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৪-২২০, দারুল ইশাআত, করাচী।)

অনুবাদক: সিনিয়র মুহাদ্দিস ও বিভাগীয় প্রধান, তাফসীর বিভাগ; জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

(ইসলামী বিবাহ; ৩১ নং পৃষ্ঠার পর)

হযরত ফাতেমাকে প্রদত্ত সাংসারিক সামানা দেয়ার বর্ণনার ভিত্তিতে মেয়েকে যৌতুক দেয়ার প্রমাণ পেশ করে থাকে। এটা মারাত্মক ভুল। কেননা হযরত ফাতেমা ছাড়াও নবীজীর আরও কয়েকজন কন্যা ছিল। নবীজী কর্তৃক তাদেরকে সাংসারিক সামান প্রদানের কোন বর্ণনা হাদীসে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, এরূপ সামানা দেয়ার ঘটনা হযরত ফাতেমা ছাড়া অন্য কোন কন্যার ক্ষেত্রে ঘটেনি। তাছাড়া জীবদ্দশায় সন্তানদের হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার ব্যাপারে কয়েকজন সাহাবীকে নবীজী সতর্ক করেছেন বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে। কাজেই তাঁর দ্বারা এ কাজটি অসম্ভব। আসল ব্যাপার হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন হযরত ফাতেমা রাযি.-এর পিতা ছিলেন, তদ্রুপ হযরত আলী রাযি.-এরও অভিভাবক ছিলেন। হযরত আলী রাযি. এর অভিভাবক হিসেবে হযরত আলীর একটি বর্ম বিক্রি করে নবীজী তাদের জন্য সাংসারিক সামানা ক্রয় করে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, এটাকে যৌতুক বা জাহিয বলা স্পষ্ট ভুল।

যৌতুক একটি মরণ ব্যাধি। যা সমাজের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সকল শ্রেণীর মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। যৌতুক দেয়ার সামর্থ্য না থাকায় অনেক মেয়ের বিবাহই হয় না। অনেক বাবা মেয়ের যৌতুকের জন্য অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করে। অনেকে আবার মানুষের কাছে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। মেয়ে যদি কালো বা ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে তাকে বিবাহ দিতে সাধ্যাতীত যৌতুক প্রদান করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার বিবাহ পরবর্তী সময়ে ছেলে বা ছেলের পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবী আদায়ে মেয়ের উপর চালানো হয় শারীরিক ও মানসিক অকথ্য নির্যাতন। যার ফলে কখনো কখনো মেয়ের জীবন নাশ হয়ে যায়, কখনো মেয়ে আত্মাহুতির পথ বেছে নেয়, কখনওবা সংসার ভেঙে যায়। আমাদের দেশের হাজারো নারী প্রতি নিয়ত এ জুলুমের শিকার হচ্ছে।

যৌতুক প্রদান ও গ্রহণ উভয়টিই অপরাধ। আমাদের দেশীয় আইনে এর জন্য নির্ধারিত শাস্তি ও জেল-জরিমানার বিধান রয়েছে। আইনী আশ্রয় গ্রহণ করে এর সাময়িক প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব নয়। তাই মরণ ব্যাধি যৌতুককে সমাজ থেকে উৎখাত করতে হলে সর্বপ্রথম চাই ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ অর্জন এবং তার প্রচার প্রসার। পাশাপাশি জনসচেতনতা, সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং শক্তিশালী প্রতিরোধও অত্যন্ত প্রয়োজন।

লেখক : ইমাম ও খতীব, দনিয়া বড় জামে মসজিদ ,যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

বড়দের লেখা

শাসন ক্ষমতা ঃ একটি বোঝা

মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান

মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নসমূহের মধ্যে 'শাসন ক্ষমতা' লাভ করা পরম কাঙ্ক্ষিত একটি স্বপ্ন। এটা এমন এক রঙিন স্বপ্ন যে, এর জন্য মানুষ তার বিদ্যা-বুদ্ধি খাটায় এবং অকাতরে অর্থ শ্রম ও মেধা ব্যয় করে। শুধু তাই নয় ক্ষমতা নামের সোনার হরিণটি অধিকার করার দুর্নিবার বাসনায় বনী আদম লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বারংবার পরাজিত হওয়ার পরও সে এই রঙিন খোয়াবের কথা ভুলতে পারে না। জানার বিষয় হল, 'শাসন ক্ষমতার' হাকীকত ও বাস্তবতা কী? কিংবা শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব-কর্তব্য কী?

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'পৃথিবী একটি আকর্ষণীয় ও মোহনীয় বস্তু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পৃথিবীর খলিফা মনোনীত করবেন। অতঃপর দেখবেন, তোমরা খিলাফতের মহান দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিচ্ছো, না কি নিজেদের মনগড়া পথে চলছো; অতএব পৃথিবীকে ভালবাসার ক্ষেত্রে তোমরা অত্যন্ত সতর্ক থেকো, আর নারী জাতির ছলনা থেকে সতর্ক থেকো। কেননা বনী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারী জাতির ফিতনা।'

বাহ্যত পৃথিবী ও পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব অত্যন্ত চাকচিক্যময় মনে হয়। মানুষের ধারণা হল, প্রচুর সম্পদ অর্জন করার মাধ্যমেই শান্তি আসে, শাসন ক্ষমতা লাভ করলেই বুঝি সুখের পায়রা ধরা দেয়! এটা এক মহা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়। বস্তুত মানব জীবনের সাফল্য নির্ভর করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর জান্নাত প্রাপ্তির উপর। ইরশাদ হচ্ছে,

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

অর্থ : যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেই প্রকৃত সফলকাম, আর দুনিয়ার যিন্দেগী তো প্রতারণার সামান ভিন্ন কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান- ১৮৫)

দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, আজ আমরা দুনিয়ার এই মায়াবী প্রতারণার পেছনেই উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটছি। আমাদের শাসক শ্রেণী যেমন এর পেছনে ছুটছেন, আমরা শাসিতরাও এর পেছনে লাটিমের মত ঘুরছি। আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনাচার ও অবিচার স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করবে না। সুবিচার কর; এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুব জ্ঞাত। (সূরা মায়িদা- ৮)

এ আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ আমাদেরকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

১। সদা সর্বদা ন্যায় ও সত্য পথে চলতে হবে।

২। কোন গোত্র বা জাতির সঙ্গে পূর্ববিদ্বেষের জের ধরে অমানবিক আচরণ করা যাবে না।

৩। সাক্ষ্য প্রদানের সময় ইনসাফ অবলম্বন করতে হবে।

৪। এবং সর্বাবস্থায় অন্তরে খোদাভীতি জাগ্রত রাখতে হবে।

বর্তমানের এ নাযুক সময়ে দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার, অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ, উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা ও কর্মকর্তাসহ দায়িত্বশীল প্রতিটি ব্যক্তির এ আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে। এ আয়াতে কারীমার আলোকে তারা ভেবে দেখবেন যে, আমরা বাস্তবিকই ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছি না কি বক্রপথ অবলম্বন করে রক্ষক সেজে ভক্ষকে পরিণত হয়েছি? আল্লাহর দয়ায় জনগণের ভোটে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর যমীনে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করছি না কি ইনসাফকে নির্বাসনে পাঠিয়ে গরিব-দুর্বলের রক্ত শোষণ, সুদ-ঘুষ ও দুর্নীতির মচ্ছব লাগিয়ে দিয়েছি?

মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণের স্মরণ রাখা উচিত, তারা কেউ এ অস্থায়ী পৃথিবীর স্থায়ী বাসিন্দা নন, তাদেরকেও একদিন আর কারও কাছে না হলেও মৃত্যুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হবে। তারপর আল্লাহ পাকের কাছে নিজেদের দায়-দায়িত্ব ও কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। তাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না , তাদের এ নেতৃত্ব কর্তৃত্ব চিরকালীন নয়, আখিরাতে অবশ্যই এর জন্যে তাদেরকে জবাবদেহীর সম্মুখীন হতে হবে।

এ মর্মে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা নের্তৃত্ব অর্জনের খায়েশ ও আকাঙ্ক্ষা করে থাকো, অথচ এ নেতৃত্বই হবে কিয়ামত দিবসে তোমাদের অপমানের কারণ। কেননা মা যখন শিশুকে দুধ পান করায় তখন দুগ্ধপায়ী বেশ তৃপ্তি পেতে থাকে কিন্তু দুধ ছাড়িয়ে দেয়ার পর শিশুর খুব কষ্ট হতে থাকে'।

ঠিক তেমনি রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রী-মিনিস্টার হওয়াতে বেশ আনন্দ লাগে; গর্ব অনুভব হয়। কিন্তু আপন অধীনস্তদের ওপর অত্যাচারের দরুন, গরীবের ন্যায্য হক আত্মসাৎ করার দরুন, দুর্নীতি ও সুদ-ঘুষের লেন-দেনের দরুন কিয়ামতের দিন যখন প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী সাহেবকে পাকড়াও করা হবে, সকলের সামনে তাকে অপদস্ত করা হবে তখন অনুশোচনায় দাঁতে ঠোঁট কাটা ছাড়া এবং হায় আফসোস! হায় আফসোস! বলা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

হযরত আম্মার রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক ব্যক্তির নেতা হবে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে দুই হাত নিজ গর্দানে বাঁধা অবস্থায় আল্লাহর দরবারে এমনভাবে উপস্থিত হবে। অতঃপর যদি সে দুনিয়াতে ইনসাফের সাথে তাদের নের্তৃত্ব দিয়ে থাকে তাহলে মুক্তি পাবে অন্যথায় এ নেতৃত্বই তাকে জাহান্নামের বিভীষিকায় নিক্ষেপ করবে'।

যারা নেতৃত্ব লাভের জন্য উদগ্রীব থাকে এবং এর জন্য জীবনপণ মেহনত করে

জনগণের জন্য এদেরকে নেতৃত্বের আমানত অর্পণ করা জায়েযও নয়।

এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'খোদার কসম, যে ব্যক্তি পদ-পজিশন লাভের জন্য লালায়িত আমি তাকে নেতৃত্ব প্রদান করি না। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব শুধু ঐ ব্যক্তিকেই অর্পণ করা হবে, যে এর প্রার্থী ও প্রত্যাশী নয়, আর সে শরীয়তের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আমলও করে এবং ন্যায় বিচার করে।

আফসোস! আমাদের নেতা-নেত্রীরা নির্বাচনের পূর্বে তো মনভোলানো গালভরা সব বুলি আওড়ান, জনসাধারণকে লাল-নীল আর স্বপ্নিল শহরের খোয়াব দেখান, কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর তারা সেগুলো বেমালুম ভুলে যান কিংবা চেপে যান বা অস্বীকার করে বসেন। ভোটদাতা আমজনতার সঙ্গে তাদের যেন মঙ্গলগ্রহের দূরত্ব সৃষ্টি হয়, ফলে রকেট (মোটা অঙ্কের ঘুষ) ছাড়া জনতা তাদের দেখা পায় না। উপরন্তু তাদের কান হয়ে যায় বধির আর চামড়াটি গণ্ডারের। ফলে জনগণের কোন ফরিয়াদ তাদের কানে পৌঁছে না এবং জনগণের কোন আহাজারি তাদের হৃদয় স্পর্শ করে না।

লক্ষ্য করুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব নেতৃত্বাকে কেমন কঠোর ভাষায় ধমকেছেন। ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি নেতৃত্ব লাভের পর জনসাধারণের আমানত খেয়ানত করবে এবং এ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ পাক এরূপ পাপিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন'।

আমরা জনসাধারণ অনেক সময় মনে করি, আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানেরা অনৈসলামিক কার্যকলাপ করে করুক, তারা গরিবের হক নষ্ট করে করুক তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কী প্রয়োজন? কেননা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে, তারা খারাপ কিছু করলে তার খারাবী তারাই ভোগ করবে। সুতরাং অন্যের ব্যাপার নিয়ে এত গলদগর্ম হওয়ার কী দরকার? মনে রাখতে হবে, আমাদের এ মানসিকতা কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে মারাত্মক ভ্রান্তিকর। কেননা যারা জেনে-শোনে ফাসিক, লম্পট ও অসৎ চরিত্রের ব্যক্তিদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে তাদেরকেও নেতাদের সঙ্গে অপরাধের বোঝা বহন করতে হবে এবং ঐ জালেম নেতার শাসনাকালে যে সকল অনৈসলামিক কার্যকলাপ সংঘটিত হবে প্রত্যেকটি কাজের জন্য (যদি তারা তা বন্ধে উদ্যোগী না হয়) কিয়ামত দিবসে ভোটদাতাকেও জবাবদেহী করতে হবে। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, 'তোমরা সৎ কর্মে ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না'।

এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল, শাসন কর্তৃত্ব পেয়ে ইনসাফের সাথে দেশ পরিচালনা না করা যেমন গুরুতর অপরাধ; তেমনিভাবে এ নিন্দনীয় অবস্থা দেখে তা বন্ধে উদ্যোগী না হওয়াও সমান অপরাধ।

এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'অচিরেই আমার মৃত্যুর পর কিছু অত্যাচারী ও অযোগ্য ব্যক্তি শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হবে, যারা ওদের কথায় উঠা বসা করবে এবং তাদের শরীয়তবিরোধী কাজে ইন্ধন যোগাবে কিংবা তাদের জুলুমে সাহায্য করবে, তারা আমার উম্মতভুক্ত নয়, আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর এই পাপাচারীরা হাশরের ময়দানে আমার হাউজে কাউসারের কাছেও আসতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে যারা তাদের শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডে বাধা দিবে, তাদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে রুখে দাঁড়াবে– এ সমস্ত পূণ্যবান ব্যক্তিরা আমার উম্মতভুক্ত থাকবে এবং আমিও এদের সাথে থাকব, আর এরা আমার হাউজে কাউসারের পানি পান করবে'।

উপসংহার

শাসন কর্তৃত্ব একটি মায়াজাল। এর ফাঁদে আটকে পড়া বোকা মানুষের কাজ। তবে কারো কাঁধে এ দায়িত্ব যদি চেপেই বসে তাহলে সে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া ও ইনসাফের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং সর্বদা ন্যায়-নীতির ওপর অটল ও অবিচল থাকবে। সেই সাথে ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হয়ে জনসাধরণকেও সে শুভ্র সমুজ্জ্বল পথে চালাতে সচেষ্ট থাকবে।

আর তাকে এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, এ নশ্বর পৃথিবীর নেতৃত্ব ও সম্পদরাজি একদিন হাতছাড়া হয়েই যাবে। সুতরাং ধরিত্রীর এ চোখ ধাঁধাঁনো চাকচিক্যে আত্মবিস্মৃত না হয়ে আখিরাতের পাথেয় অর্জনে উদ্যোগী হওয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার দাবী।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

লেখক: শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

التدريب فى اصول الفقه

২০ শে শা'বান হতে ২৯ শে শা'বান

উসূলুল ফিকহ-এর তামরীনী কোর্স

কোর্স করাবেন : **মুফতী ইয়াহইয়া দা.বা.**

মুহতামিম, মাছনা মাদরাসা, যশোর।

স্থান : জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা

বসিলা রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

শর্ত : উসূলুল ফিকহ এর যে কোন একটি কিতাব পড়া থাকতে হবে।

ভর্তি ফি ও থাকা-খাওয়া বাবদ সর্বমোট খরচ ১০০০/- টাকা।

যোগাযোগ : ০১৭১৫৭৮২২২০, ০১৯৭৯০৯২১৫৩

মাযহাব ও তাকলীদ

আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

৯ই মার্চ '১৫ জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার উদ্যোগে জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাঠে আয়োজিত বার্ষিক মাহফিলে মুনাযিরে যামান, তরজুমানে আহলে হক হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দা.বা.এক সারগর্ভ বয়ান পেশ করেন। পাঠকের উপকারার্থে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনসহ তা প্রকাশ করা হল। -সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.

হাযারাতে উলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত সুধী সমাজ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআন থেকে সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতের শেষাংশ তিলাওয়াত করেছি এবং হাদীসের ভাণ্ডার থেকে একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পাঠ করেছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াতের অংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম'। এই আয়াতের তিনটি বিষয় আমাদের বুঝতে হবে।
(১) 'আজ' দ্বারা কোন দিনকে বুঝালেন?
(২) 'দীন' দ্বারা কী বুঝালেন?
(৩) 'পরিপূর্ণ করা'র দ্বারা কী বুঝালেন?
মুফাসসিরীনে কেরাম লেখেন, 'এই আয়াত ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছরই হজ্জ পালন করেন এবং এর তিন মাস পর ইন্তিকাল করেন। এ হজ্জে তিনি উম্মতের কাছ থেকে বিদায় নেন, তাই একে বিদায় হজ্জ বলে। প্রায় লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে আরাফার ময়দানে যে ভাষণ দেন, ঐ ভাষণকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সে দিনটি ছিল দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার।

'دين -দীন' শব্দটি কোন কোন আয়াতে 'ধর্ম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতে 'দীন' শব্দটি যদি 'ধর্ম' অর্থে নেয়া হয়, তাহলে এমন বিপত্তি দেখা দেয়, যার সমাধান বের করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দুই মাস ২১ দিন পর এই আয়াত- وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. অবতীর্ণ হয়। তিন মাস পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া আয়াতে 'দীন' শব্দের অর্থ যদি 'ধর্ম' হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার তিন মাস পূর্বেই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়েছে। তাহলে দুই মাস পর অবতীর্ণ হওয়া আয়াত ধর্মের ভিতরে না বাইরে? যদি ভিতরে ধরা হয়, তাহলে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গেল কীভাবে! আর যদি বাইরে ধরা হয়, এর অর্থ দাঁড়ায় আমাদের কুরআনে এমন আয়াতও আছে যা ধর্মের বাইরে! এই বিপত্তি নিরসনের জন্যই মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, 'আলোচ্য আয়াতে দীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'ইসলামের বিধি-বিধান'। পবিত্র কুরআনের মাত্র ৫০০ আয়াতে ইসলামের বিধি-বিধান আলোচনা হয়েছে। আর বাকী আয়াতগুলো নসীহত সম্বলিত। বিধি-বিধানের আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জ পর্যন্ত নাযিল করা হয়েছে। আর নসীহত সম্বলিত আয়াত বিদায় হজ্জের দুই মাস ২১ দিন পর পর্যন্তও অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, আলোচ্য আয়াতে দীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইসলামের বিধি-বিধান। তাই আয়াতের মর্ম এই দাঁড়াল যে, বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

এই পরিপূর্ণতার ব্যাখ্যা অনেক বিস্তৃত, যা এ সংক্ষিপ্ত সময়ে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই পরিপূর্ণ বিধান কোথায় পাওয়া যাবে –নিত্য দিনের জীবনে যা আমাদের প্রয়োজন পড়ে– আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে এর উত্তর আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ...

ইমাম রাযী রহ. স্বীয় গ্রন্থ *তাফসীরে কাবীরে* লেখেন, أطيعوا الله এর অর্থ হল, 'তোমরা আল্লাহর বিধান পালন কর'। কিন্তু সমস্ত বিধি-বিধান একত্রে এক স্থানে পাওয়া যায় না। কিছু বিধান পাওয়া যায় কুরআনে, কিছু বিধান হাদীসে, কিছু বিধান উম্মতের ইজমায়, আর কিছু বিধান পাওয়া যায় মুজতাহিদীনের ইজতিহাদে। এই চার ঠিকানায় ইসলামের সকল বিধি-বিধান পাওয়া যায়।

এরপর ইমাম রাযী রহ. লেখেন, أطيعوا الله এর মর্ম হল, 'ইসলামের যে বিধান কুরআনে পাও তা কুরআন থেকে গ্রহণ কর। وأطيعوا الرسول এর মর্ম হল, যে বিধান আল্লাহর রাসূলের হাদীসে পাও তা হাদীস থেকে গ্রহণ কর। وأولى الأمر منكم এর মর্ম হল, যে বিধান উম্মতের ইজমায় পাও তা উম্মতের ইজমা থেকে গ্রহণ কর। আর فإن تنازعتم الخ এর মর্ম হল, যে বিধান মুজতাহিদীনের ইজতিহাদে পাও তা মুজতাহিদীনের ইজতিহাদ থেকে গ্রহণ কর। সুতরাং সকল বিধি-বিধান পাওয়ার ঠিকানা চারটি। প্রথম ঠিকানার নাম 'কুরআন', দ্বিতীয় ঠিকানার নাম 'হাদীস', তৃতীয় ঠিকানার নাম 'উম্মতের ইজমা' এবং চতুর্থ ঠিকানার নাম 'ইমামগণের মাযহাব'।

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের বিধি-বিধান চার ঠিকানায় দিলেন কেন? যদি সকল বিধি-বিধান কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিতেন, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হত। এ প্রশ্নের উত্তর হল, যদি আল্লাহ তা'আলা সকল বিধি-বিধান সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিতেন, তাহলে বান্দা এমন বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হত যার সমাধান করা আর সম্ভব হত না।

এর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, রমাযান মাসের রোযা রাখা ফরয। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.
অর্থ: তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। কিন্তু কতদিন রোযা রাখতে

হবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, বরং অস্পষ্ট রেখেছেন। কারণ যদি সুস্পষ্ট কোন তারিখ নির্ধারণ করে দিতেন, তাহলে বান্দা এমন সমস্যায় পড়ত যার থেকে উত্তোরণের পথ খুঁজে বের করা মুশকিল হত। যেমন ধরুন, যদি আল্লাহ তা'আলা বলে দিতেন, রমাযান মাসের রোযা ৩০দিন রাখতে হবে, তাহলে যে বছর রমাযানের ২৯ তারিখ সন্ধ্যা বেলায় ঈদের চাঁদ দেখা যেত, ঐ বছর ঈদের দিনেও আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনার্থে রোযা রাখতে হত।

সুতরাং যেহেতু কতদিন রোযা রাখতে হবে কুরআনে কারীমে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি, তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অস্পষ্ট বিধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, যে মাস ২৯ দিনে হবে সে মাসে তোমরা ২৯টি রোযা রাখবে। আর যে মাস ৩০ দিনে হবে সে মাসে তোমরা ৩০টি রোযা রাখবে।

আবার কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনা করেননি, বরং অস্পষ্ট রেখেছেন এবং আমাদের সুবিধা ও উপকারের জন্য অস্পষ্ট রেখেছেন। এর একটি উদাহরণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'শবে কদরে'র নির্ধারিত তারিখের কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার ভুলিয়ে দিয়েছেন। যাতে আমার উম্মতের সওয়াব বেশি হয়। সুতরাং তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে শবে কদর তালাশ কর।' এখন যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নির্ধারিত তারিখ বলে দিতেন তাহলে অধিকাংশ উম্মত শুধু ঐ তারিখেই ইবাদত করত। কিন্তুউম্মতের যাতে সওয়াব বেশি হয় এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরের তারিখ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের অনেক অস্পষ্ট বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যে সকল অস্পষ্ট বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেননি, সেগুলো কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণা করে বের করার জন্য একদল লোককে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান কি কি তাও জানে, অস্পষ্ট বিধান কি কি তাও জানে এবং কুরআন ও হাদীস থেকে অস্পষ্ট বিধি-বিধান গবেষণা করে বের করার যোগ্যতাও রাখে।

এই গবেষণাকে পরিভাষায় 'ইজতিহাদ' বলা হয়। যারা গবেষণা করেন তাদেরকে 'মুজতাহিদীন' বলে। আর কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিধান উদ্ভাবন করাকে 'ইস্তিম্বাত' বলে। সূরা নিসার ৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'মুজতাহিদ'গণকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন।

মুজতাহিদগণ যদি সমাধান বের করতে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাধান বের করতে পারেন, তাহলে তাকে উম্মতের 'ইজমা' বলে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন মুজতাহিদ ভিন্ন ভিন্ন সমাধান বের করে, তাহলে তাকে এক এক মুজতাহিদের এক এক 'মাযহাব' বলে।

ইজমা এবং মাযহাবের উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর কে হবেন তাঁর প্রথম খলীফা; এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে স্পষ্ট কিছু নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুস্পষ্ট করে কিছু বলেননি যে, হযরত আবু বকর হবেন তাঁর প্রথম খলীফা। যে কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণা শুরু করলেন। গবেষণায় এ আলোচনা আসল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তিনি নামাযের ইমামতির জন্য হযরত আবু বকর রাযি. কে নিযুক্ত করেছিলেন। সে সময় সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর কোমল হৃদয়ের মানুষ। তাকে ইমাম নিযুক্ত করা হলে নামাযের মধ্যে আপনার অসুস্থতার তার কথা মনে পড়বে। এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়বেন এবং নামায নষ্ট করে ফেলবেন। ফলে জামাআতে অংশগ্রহণকারীদের নামাযও নষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হযরত উমর রাযি. সবল হৃদয়ের অধিকারী। যদি তাকে ইমাম নিযুক্ত করেন, তাহলে আপনার কথা স্মরণ হলেও তিনি তার নামায নষ্ট করবেন না এবং জামাআতের নামাযও নষ্ট হবে না। এ পরামর্শ দেয়ার পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না! ইমাম আবু বকরই হবে।

এই হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যেমনিভাবে হযরত আবু বকর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় নামাযের জন্য ইমাম নিযুক্ত হয়েছিলেন, তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরেও সমাজের ইমাম/খলীফা তিনিই নিযুক্ত হবেন।

হযরত আবু বকর রাযি. এর খলীফ নিযুক্ত হওয়া সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ছিল। পরিভাষায় যাকে 'ইজমা' বলা হয়। এই ইজমা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن الله لا يجمع امتي على ضلالة ابدا.

এর মর্মার্থ হল, উম্মত সর্বসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে সে সিদ্ধান্ত শতভাগ নির্ভুল ইসলামী বিধান বলে গণ্য হবে। সিদ্ধান্ত দিল বান্দা আর ইসলামী বিধান গণ্য হল আল্লাহর কাছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি বলে কুরআন মানি; হাদীস মানি, এছাড়া আর কোন দলীল মানি না। তাহলে সে أولى الامر এর আয়াতই বা মানলো কোথায় এবং ইজমা এর হাদীসই বা মানলো কোথায়! এটা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইজমা'র ভিত্তিতে হযরত আবু বকর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোগ্য খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ইজমা তিন প্রকার অথবা বলা যায় ইজমার তিনটি স্তর।

(এক) সাহাবাগণের ইজমা।

(দুই) মুজতাহিদগণের ইজমা।

(তিন) উলামায়ে কেরামের ইজমা।

কোন বিষয়ে যদি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ইজমা হয় তাহলে সে ব্যাপারে কোন মুজতাহিদের দ্বিমত করার কোন অধিকার থাকে না। যেহেতু হযরত আবু বকর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাই এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কোন দ্বিমত নেই, করার অধিকারও নেই। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কোন দ্বিমত নেই, করার অধিকারও নেই। ইমাম মালেক রহ. এর কোন দ্বিমত নেই, করার অধিকারও নেই। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কোন দ্বিমত নেই, করার অধিকারও নেই।

এবার শুনুন, ভিন্ন ভিন্ন মুজতাহিদের ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব কখন হয়? এর উত্তর হল,

যখন মুজতাহিদদের সিদ্ধান্ত ঐক্যবদ্ধ না হয়।

ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের একটা উদাহরণ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে গমন করেছেন এবং সশরীরে সাত আসমান ও জান্নাত-জাহান্নাম দেখেছেন। কিন্তুআল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে চাক্ষুষ দেখেছেন কি না এ ব্যাপারে না কুরআনে সুস্পষ্ট কিছু বর্ণিত হয়েছে আর না রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে কিছু বলেছেন। এমতাবস্থায় সমাধান বের করতে হয় ইজতিহাদ দ্বারা। তাই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. ইজতিহাদ করেছেন এবং রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-ও ইজতিহাদ করেছেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, কথাবার্তা হয়েছে বটে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুষ দেখেননি। এটা হযরত আয়েশা রাযি. এর মাযহাব। অপরদিকে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুষ দেখেছেন। এটা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর মাযহাব।

এখন আপনারাই বলুন, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মাযহাব ছিল কি না? তাহলে আমাদের সমাজের লা-মাযহাবীরা যে বলে, সাহাবাদের মধ্যে কোন মাযহাব ছিল না! আসলে ওরা মাযহাবও চিনে না এবং সাহাবাও চিনে না। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্যে শত শত মাযহাব ছিল। চার মাযহাবের ইমামগণ ঐ সকল মাযহাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের দ্বিতীয় উদাহরণ। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ –যাদেরকে তাদের স্বামীরা তালাক দিয়েছে– তারা কতদিন পর অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে? সাথে সাথেই পারবে, না কিছুদিন পরে? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

অর্থ : যে নারীদের তালাক দেয়া হয়েছে তারা তিন 'কুরু' পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে।

قُرُوء 'কুরু' শব্দটি আরবী অভিধানে দুটি বিপরীতমুখী অর্থ প্রদান করে। (এক) নারীদের ঋতুস্রাব কালীন অপবিত্রতার সময়। (দুই) নারীদের পবিত্রকালীন সময়। দেখা যাচ্ছে, আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট। উভয় অর্থই কুরআনে আছে। এমতাবস্থায় যদি ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলতেন, তিন অপবিত্র অবস্থা অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে, তাহলে এটা ইজমা হত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, قُرُوء এর অর্থ পবিত্র অবস্থা। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, قُرُوء এর অর্থ অপবিত্র অবস্থা।

সুতরাং এখানে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাযহাব এক রকম আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব আরেক রকম। এখন কথা হল, এই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত মনগড়া না কুরআনমাফিক? কোন মাযহাব সঠিক? হানাফী এবং শাফেয়ী সিদ্ধান্তের কোনটি কুরআন বিরোধী? সবই তো কুরআনসম্মত। তাহলে লা-মাযহাবীরা যে বলে, কুরআন থাকতে মাযহাব কিসের? গণ্ডমূর্খরা এ প্রশ্নের জবাবও বোঝে না। কুরআনই তো মাযহাবের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। কুরআনের দেখানো রাস্তায়ই তো হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। লা-মাযহাবীরা প্রশ্ন করে, হানাফী শুদ্ধ না শাফেয়ী শুদ্ধ? আমি প্রশ্ন করি قُرُوء এর দুই অর্থের কোনটি শুদ্ধ আর কোনটি অশুদ্ধ? দু'টিই তো শুদ্ধ, তাহলে মাযহাব অশুদ্ধ হবে কেন? আসল কথা হল, তোমাদের মস্তিষ্কই 'অশুদ্ধ' ও বিকৃত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের (রাযি.) মাযহাব কুরআন-হাদীসের নির্দেশেই সৃষ্টি হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সাহাবাদের রাযি. ইখতিলাফ ও মতভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথার দ্বারাও সমর্থন করেছেন এবং নীরবতার দ্বারাও সমর্থন দিয়েছেন।

এর একটি উদাহরণ। ইসলামের ইতিহাসে 'গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা' নামক একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা 'বনু কুরাইযা' পৌঁছে আসরের নামায আদায় করবে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন এ পরিমাণ সময় ছিল যে, বনু কুরাইযায় পৌঁছে আসর নামায আদায় করা সম্ভব। কিন্তু পথিমধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব হয়ে যায়। যে কারণে সাহাবাগণের মাঝে দুটি মাযহাব সৃষ্টি হয়। কিছু সংখ্যক সাহাবী বললেন, আমরা বনু কুরাইযায় গিয়েই নামায আদায় করব। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চেয়ে ভালো বোঝেন। আর অবশিষ্ট সাহাবীগণ বললেন, আমরা এখানেই নামায আদায় করে নিব। কারণ অযাচিত বিলম্বের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন না। যদি জানতেন তাহলে এখানেই নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন। সুতরাং এখন হাদীসের উপর আমল না করে إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. এই আয়াত অনুযায়ী আমল করে নামায পড়তে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এক দিনের আসর নিয়ে দুই মাযহাব হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করা হল। তিনি উভয় দলের কর্মকে সমর্থন দিয়ে দিলেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মুসলমানদের মাযহাবকে সমর্থন দিয়ে দেন, তবে লা-মাযহাবীদের মাযহাব মানতে ভয় কিসের? তাই আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ইসলামের পরিপূর্ণ বিধান চার ঠিকানায় পাওয়া যাবে। অতএব যে বিধান যে স্থানে পাওয়া যাবে ঐ বিধান ঐ স্থান থেকেই নিতে হবে। সুতরাং أطيعوا الله দ্বারা নির্দেশ করে দিয়েছেন, যে বিধান কুরআনে পাওয়া যাবে ঐ বিধান কুরআন থেকে নিতে হবে। أطيعوا الرسول দ্বারা নির্দেশ করে দিয়েছেন, যে বিধান হাদীসে পাওয়া যাবে ঐ বিধান হাদীস থেকে নিতে হবে। وأولى الامر منكم দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিধান উম্মতের ইজমায় পাওয়া যাবে, ঐ বিধান উম্মতের ইজমা থেকে নিতে হবে। فإن تنازعتم فى شئ الخ দ্বারা নির্দেশ করে দিয়েছেন, যে বিধান ইমামগণের মাযহাবে পাওয়া যাবে ঐ বিধান ইমামগণের মাযহাব থেকেই নিতে হবে।

এরপরও তারা এ কথা বলে ফিতনা সৃষ্টি করে যে, ইসলামে যদি মাযহাব বলতে কিছু থাকত, তাহলে সাহাবাদের মাঝেও মাযহাব থাকত, যারা কি না সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইসলাম শিখেছেন। আমি বলতে চাই, এরা এত বড় গণ্ডমূর্খ যে, এরা জানে না হযরত আবু বকর রাযি. এর একটা মাযহাব ছিল, হযরত উমর রাযি. এর একটা মাযহাব ছিল, হযরত উসমান

রাযি. এর একটা মাযহাব ছিল, হযরত আলী রাযি. এর একটা মাযহাব ছিল, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর একটা মাযহাব ছিল, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর একটা মাযহাব ছিল।

এর একটি উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে 'তারাবীহ' এর জন্য মসজিদে গমন করলেন। (এই তারাবীহ নিয়েও ওরা গণ্ডগোল করে। ওরা বলে, তারাবীহ আট রাকাআত, বিশ রাকাআত নয়। ওরা দলীল দেয় ঐ হাদীস দ্বারা যেখানে বলা হয়েছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাকাআত পড়তেন। তিন রাকাআত বিতর, অবশিষ্ট আট রাকাআত তারাবীহ। অথচ এই হাদীসের শেষেই আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই এগার রাকাআত সারা বছর পড়তেন। আপনাদের নিকট আমার প্রশ্ন, তারাবীহর নামায কি সারা বছর হয়? ওরা 'তাহাজ্জুদ' এর হাদীস দ্বারা তারাবীহ এর দলীল দেয়। মানুষের সাথে কী পরিমাণ প্রতারণা করে এই ধোঁকাবাজ লা-মাযহাবীরা!

আমরা বলি, তারাবীহর নামায বিশ রাকাআত। *মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে* আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ রাকাআত তারাবীহর নামায পড়তেন। এই হাদীসের শেষে আছে, এই বিশ রাকাআত শুধু রমাযানে পড়তেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানে শুধু তেইশ রাকাআত পড়তেন। বিশ রাকাআত তারাবীহ আর তিন রাকাআত বিতর। উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও বিশ রাকাত তারাবীহর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হল আমাদের সবচেয়ে বড় দলীল।)

যাই হোক, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহর নামায পড়ার জন্য মসজিদে তাশরীফ নিলেন। আশপাশের সাহাবীগণও ইকতিদা করলেন। পর দিন প্রথম দিনের তুলনায় সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতি বেশি হল। কিন্তু তৃতীয় দিন সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতি আশাতীত বেশি হল। এ কারণে চতুর্থ দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণ সমবেত হওয়া সত্ত্বেও নামাযে গেলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, আমার ভয় হয়, তোমাদের এরূপ জামাআতে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ দেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবার আমার উম্মতের উপর তারাবীহর জামাআত ওয়াজিব করে না দেন! এ কারণে আমি গত রাতে জামাআতে উপস্থিত হইনি।

এ থেকে হযরত আবু বকর রাযি. এর মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যখন হযরত আবু বকর রাযি. খলীফাতুল মুসলিমীন হলেন, তখন তিনি মসজিদে তারাবীহর জামাআত করা থেকে বারণ করলেন। এটা হযরত আবু বকর রাযি. এর মাযহাব।

হযরত আবু বকর রাযি. এর ইন্তিকালের পর যখন হযরত উমর রাযি. খলীফা হলেন, তখন তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কারণে বাকী দিনগুলোতে মসজিদে যাননি তার কারণও আমরা হাদীসে অনুসন্ধান করলে খুঁজে পাই। রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল, যে আগ্রহ নিয়ে আমার উম্মত তারাবীহর জামাআতে শরীক হচ্ছে, না জানি এ আগ্রহ দেখে আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর তারাবীহর জামাআত ওয়াজিব করে দেন। যার কারণে তিনি জামাআতে যাননি। হযরত উমর রাযি. বললেন, এখন যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেই। সুতরাং তারাবীহর জামাআত ওয়াজিব হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। তাই আমরা এখন মসজিদে গিয়ে তারাবীহর নামায জামাআতের সাথে পড়বো। অগত্যা যদি কেউ জামাআতে শরীক না হতে পারে তাহলে সে গুনাহগার হবে না। এটা হল হযরত উমর রাযি. এর মাযহাব।

তাহলে লা-মাযহাবীরা যে বলে, সাহাবাদের মধ্যে কোন মাযহাব ছিল না, বাস্তবতা হল, ওরা সাহাবাও চিনে না, মাযহাবও চিনে না।

এবার দেখুন, হানাফী মাযহাব এ দুয়ের মাঝে কিভাবে সমন্বয় ঘটিয়েছে। তারা বলেন, মসজিদে জামাআতের সাথে তারাবীহর নামায পড়তে হবে। এটা হযরত উমর রাযি. এর মাযহাব। আর যদি কোন সমস্যার কারণে মসজিদে যেতে না পারে তাহলে ঘরে একাকী পড়ে নিবে। এটা হযরত আবু বকর রাযি. এর মাযহাব। এগুলো জানতে হবে এবং জেনে নিজেকে ওদের থেকে দূরে রাখতে হবে।

আজকাল বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে ওরা বলতে থাকে, হানাফী মসজিদ, হানাফী ইমাম, হানাফী মুআযযিন, হানাফী কমিটি, হানাফী পরিচালনা, আরো কত কি। এরা গিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধে এবং বলে যে, হাদীসে আছে। আমরা বলি, হাদীসে কি শুধু বুকের উপর হাত বাঁধার কথা আছে! হাদীসে তো নাভীর নীচেও হাত বাঁধার কথা আছে। কোন মাযহাব না মেনে তারা একই সঙ্গে দুই হাদীসের উপর আমল করে দেখাতে পারবে? বুকের উপর হাত বাঁধলে নাভীর নীচে হাত বাঁধার কোন হাত তো থাকে না। তারা যদি এতই বুঝে থাকে তাহলে দুই হাদীসের উপর আমল করে দেখাক।

এবার দেখুন, হানাফী মাযহাব দুই হাদীসের মাঝে কিভাবে সমন্বয় ঘটিয়েছে। তারা বলেন, পুরুষরা নাভীর নীচে হাত বাঁধবে আর নারীরা বুকের উপর হাত বাঁধবে।

তাহলে বুঝা গেল, হাদীস মানতে হলে আগে মাযহাব মানতে হবে। মাযহাব মানা ছাড়া হাদীস মানা যায় না।

এর আরো একটা উদাহরণ দেখুন, এরা আরো বলে, আমরা হাদীস মানি। কিন্তু শুধু সহীহ হাদীস মানি, অন্য কিছু না। এটা আরেকটা ধোঁকাবাজী কথা। ইমাম বুখারী রহ. ছয় লক্ষ হাদীস জানতেন। তিন লক্ষ তার মুখস্ত ছিল। আর তিন লক্ষ তার নিকট লিখিত ছিল। এই ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে (এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী) ৬২৭৫টি হাদীস বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশিষ্ট ৫৯৪০০০টি হাদীস সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, এগুলো আমার নিকট সহীহ নয়।[১] লা-মাযহাবীরা হাদীস সহীহ এবং সহীহ নয় সম্পর্কে কি বুঝে! তারা বোঝে 'সহীহ' অর্থ 'শুদ্ধ'। আর 'সহীহ নয়' অর্থ 'ভুল'। তাহলে ইমাম বুখারী রহ. এর সংগ্রহে ছয় লক্ষ হাদীসের মধ্যে ছয় হাজার হাদীস সহীহ, আর বাকী পাঁচ লক্ষ চুরানব্বই হাজার হাদীস ভুল। অর্থাৎ আপনার রাসূল ভুল বলেছেন! কোন বেয়াদব বলতে পারে এমন কথা? আপনার রাসূল জীবনে কতটি অশুদ্ধ ও ভুল কথা বলেছেন? হাদীসের এ সকল পরিভাষা বুঝার যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাদের দেশে

[১] ইমাম বুখারী রহ. তার গ্রন্থে কোন হাদীস অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্ণনাকারীর অবস্থা, সূত্রের অবিচ্ছিন্ন ধারা যাচাইয়ের সাথে সাথে হাদীসটি কিতাব সংকলনে তার সৃষ্টিশীল পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াও আবশ্যক ছিল। এসব শর্ত পাওয়া যাওয়ার পর তিনি ইস্তিখারা করতেন যে, সহীহ বুখারীতে তা অন্তর্ভুক্ত করবেন কি না? অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে অন্তর ধাবিত হলেই তিনি অন্তর্ভুক্ত করতেন। ইমাম বুখারীর কোন হাদীস সহীহ বুখারীতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার শর্ত দ্বারা এই কথাই বুঝানো হয়ে থাকে।

প্রচলিত মাদরাসাগুলোতে লাগাতার অন্তত দশ বছর পড়তে হয়। আপনারা তো দশ বছর পড়ে আসেননি। তাই পরিপূর্ণ বুঝাতে পারব না। হ্যাঁ! ইনশাআল্লাহ মোটামুটিভাবে বুঝতে পারবেন যে, হাদীস 'সহীহ' কাকে বলে আর হাদীস 'সহীহ না' কাকে বলে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি জিনিসের নাম হল 'হাদীস'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসের 'কাজ', রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে 'কথা', রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সমর্থন'। এই তিনটাই হল হাদীস। কিন্তু কথা হল, দেড়শো বছর পর এই হাদীস আমাদের নিকট কিভাবে পৌঁছল? হযরত জিবরাঈল আ. দিয়ে গেছেন? না, বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। রাসূল থেকে তাঁর সাহাবাগণ, তাদের থেকে তাবেঈ, তাদের থেকে তাবে তাবেঈ এভাবে বর্ণনা করে আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পৌঁছেছে।

এক এক বর্ণনাকারীকে পৃথক পৃথকভাবে হাদীসের পরিভাষায় 'রাবী' বলা হয়। একটি হাদীসের আগা-গোড়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বর্ণনাকারীদের সমষ্টিগত নাম 'হাদীসের সনদ'। আর বর্ণিত 'হাদীস'কে বলে 'হাদীসের মতন'।

রাসূলের হাদীস বর্ণনা করার জন্য কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না? সকলের যোগ্যতা কি সমান হয়? এই যোগ্যতার ভিত্তিতে হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) উত্তম যোগ্যতা সম্পন্ন বর্ণনা-কারীদের বর্ণিত হাদীস।

(২) মধ্যম যোগ্যতা সম্পন্ন বর্ণনা-কারীদের বর্ণিত হাদীস।

(৩) নিম্ন মানের যোগ্যতা সম্পন্ন বর্ণনা-কারীদের বর্ণিত হাদীস।

উত্তম যোগ্যতা সম্পন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসের নাম 'সহীহ হাদীস'। মধ্যম যোগ্যতা সম্পন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসের নাম 'হাসান হাদীস'। আর নিম্নমানের যোগ্যতা সম্পন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসের নাম 'যঈফ হাদীস'।

'যঈফ' শব্দের অর্থ 'দুর্বল'। হাদীসের বেলায়ও কি 'যঈফ' শব্দ দুর্বল অর্থেই ব্যবহৃত হবে? আপনার রাসূল জীবনে কতটি দুর্বল কথা বলেছেন? আপনাদের রাসূল জীবনে কতবার দুর্বল কাজ করেছেন? তাহলে এই লা-মাযহাবীরা যঈফ হাদীস বলতে নিজেই বা কি বোঝে! আর সাধারণ জনগণকেই বা কি বুঝায়? কখনো এদের ধোঁকায় পড়বেন না।

এখন বলেন, যঈফ হাদীস কি রাসূলের হাদীস নয়? হাসান হাদীস কি রাসূলের হাদীস নয়? সহীহ হাদীস কি রাসূলের হাদীস নয়? আসলে কোন হাদীস কোন কাজে লাগে এটা তারা জানেও না, মানেও না।

ইসলামের কোন আক্বীদা-বিশ্বাস প্রমাণের জন্য সহীহ হাদীস কাজে লাগে। ইসলামের কোন আমল প্রমাণের জন্য হাসান হাদীস কাজে লাগে। আর কোন আমলের ফযীলত প্রমাণ করার জন্য যঈফ হাদীসও কাজে লাগে। তাহলে বলুন, কোন হাদীস কাজে লাগে না? সব হাদীসই তো কাজে লাগছে। অথচ লা-মাযহাবীরা বলে যে, সহীহ হাদীস মানি, অন্য হাদীস মানি না। তাহলে অন্য হাদীস যে কাজে লাগে ঐ কাজ করবে কি দিয়ে? কারণ তুমি তো মানো না!

বস্তুত আমল প্রমাণের জন্য হাসান হাদীস কাজে লাগে। না মানলে তুমি আমল প্রমাণ করবে কি দিয়ে? তুমি তো সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস মান না। ফযীলত প্রমাণের জন্য যঈফ হাদীসও কাজে লাগে তুমি তো সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস মান না, তাহলে তুমি ফযীলত প্রমাণ করবে কি দিয়ে?

এরপরও যদি একটু সময়ের জন্য মেনে নিই, তারা শুধু সহীহ হাদীস মানে, অন্য হাদীস মানে না; আমরা বলবো, সহীহ হাদীস কাকে বলে এ ব্যাপারে দুই মাযহাব। ইমাম বুখারী রহ. এর মাযহাব আলাদা। ইমাম মুসলিম রহ. এর মাযহাব আলাদা। ইমাম বুখারী রহ. এর মাযহাব মতে সহীহ হাদীস এক রকম, আর ইমাম মুসলিম রহ. এর মাযহাব মতে সহীহ হাদীস অন্য রকম। তোমরা যে সহীহ হাদীস মান, অন্য হাদীস মান না। ইমাম বুখারী রহ. এর মাযহাব মতে সহীহ হাদীস মান, না ইমাম মুসলিম রহ. এর মাযহাব মতে সহীহ হাদীস মান? যদি বল, ইমাম বুখারীর মাযহাব মতে সহীহ হাদীস মানি, তাহলেও হাদীস মানার আগে মাযহাব মানা হল। আর যদি বল, ইমাম মুসলিমের মাযহাব মতে সহীহ হাদীস মানি, তবুও হাদীস মানার আগে মাযহাব মানতে হল। সুতরাং সর্বাবস্থায়ই হাদীস মানার আগে মাযহাব মানতে হবে।

তারা ফিতনা করে আমাদের হানাফী মসজিদে এসে বুকের উপর হাত বাঁধা নিয়ে এবং নাভীর নীচে হাত বাঁধা নিয়ে। যেমনিভাবে বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস আছে, ঠিক তদ্রূপ নাভীর নীচেও হাত বাঁধার হাদীস আছে। নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীস বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীসের চেয়ে বেশি সহীহ। লা-মাযহাবীদের পুরুষেরাও বুকের উপর হাত বাঁধে এবং নারীরাও বুকের উপর হাত বাঁধে। নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীসের উপর না লা-মাযহাবীদের পুরুষরা আমল করে আর না তাদের নারীরা আমল করে। তাহলে হাদীস মানল কোথায়? কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, বুকের উপর হাত বাঁধবে মহিলারা আর নাভীর নীচে হাত বাঁধবে পুরুষরা।

হাদীস মানি, মাযহাব মানি না এটাও একটা প্রতারণা। হাদীস সবগুলো অনুসরণ ও অনুকরণ যোগ্য নয়। কিছু হাদীস আছে অনুসরণযোগ আর কিছু হাদীস আছে অনুসরণযোগ্য নয়। এর একটি উদাহরণ, সহীহ হাদীসে সাময়িক বিবাহের বিবরণ আছে। ইলমে ফিকহের পরিভাষায় একে 'নিকাহে মুতআ' বলে। আর বাংলায় সাময়িক বিবাহ বলে। এর পদ্ধতি হল, এক পুরুষ অন্য এক মহিলাকে বলল, আমি তোমাকে ৫০০ টাকার বিনিময়ে এক মাসের জন্য বিবাহ করলাম। অথবা পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে এক বছরের জন্য বিবাহ করলাম ইত্যাদি। এটা উম্মতের জন্য অনুসরণযোগ্য নয়।

কোন হাদীস অনুসরণযোগ্য আর কোন হাদীস অনুসরণযোগ্য নয় সেটা বুঝার জন্য পনের বছর পড়তে হয়। যারা মসজিদে এসে জোরে আমীন বলে এবং বুকের উপর হাত বাঁধে তারা তো পনের দিনও পড়েনি, পনের বছর তো দূরের কথা।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে নয়জন বিবিকে রেখেছেন। তারা মানে? মানা হালাল হবে না হারাম?

হাদীসের ভাণ্ডারের হাদীস হল ফার্মেসীর ওষুধের মত। আর মুজতাহিদীন ইমামগণ হলেন এম.বি.বি.এস ডাক্তারের মত। ফার্মেসীতে সব ধরনের ওষুধ আছে। কিন্তু কোন ওষুধ কোন রোগীর জন্য সেটা বলা ফার্মেসী ওয়ালার কাজ নয়। এটা বলা এম.বি.বি.এস ডাক্তারের

কাজ। ঠিক তেমনিভাবে হাদীসের ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ হাদীস আছে। কোন হাদীস কোন উম্মতের জন্য অনুসরণযোগ্য আর কোন উম্মতের জন্য অনুসরণযোগ্য নয় এটা বলা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কাজ, ইমাম শাফিয়ী রহ. এর কাজ, ইমাম মালেক রহ. এর কাজ, ইমাম আহমাদ রহ. এর কাজ।

লা-মাযহাবীরা যে সকল খুটিনাটি বিষয় নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করে। তার মধ্য থেকে একটি হল, ফজর, মাগরিব, ইশার নামাযে ইমাম যখন সূরা ফাতিহা শেষ করে তখন তারা জোরে আমীন বলে।

সূরা ফাতিহার পর আমীন বলা সুন্নত। হাদীসে এ ব্যাপারে দুই ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়েছে। আস্তে ও জোরে। লা-মাযহাবীরা আমীন জোরে বলে। তাহলে আস্তে বলার হাদীসের উপর আমল করল কোথায়! যদি তাদের হাদীস মানতেই হয় তাহলে উভয় হাদীসের উপর আমল করতে হবে। যদি জোরে বলে তাহলে আস্তে বলার হাদীসের উপর আমল করবে কিভাবে? এজন্য ওরা মিথ্যা দাবী করে এবং নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে। আহলে হাদীসের অর্থ যদি হয় সকল হাদীসের অনুসারী তাহলে এ অর্থে কোন মুসলমান আহলে হাদীস হতে পারে না। কারণ, হাদীসে নয় বিবির কথা আছে, মুসলমান হয়ে কিভাবে সে নয় বিবি রাখবে? আর যদি অর্থ হয় সব হাদীস অনুসরণকারী নয় তাহলে 'আহলে হাদীস' কাকে বলে এটা বলতে হবে। হাদীসে এসেছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نضر الله إمرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أدها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه غير فقيه.

যারা হাদীস শিক্ষা করল এবং সংরক্ষণ করল লিখে হোক বা মুখস্থ করে, বিনষ্ট হতে দিল না লিখে হোক অথবা মুখস্থ করে এবং অপরকে শিক্ষা দিল। এই চার গুণ যাদের মধ্যে থাকবে, তারা হল মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় 'আহলে হাদীস'। লা-মাযহাবীদের মধ্যে এই চার গুণের একটিও নেই।

যাই হোক, হাদীসে জোরে আমীন বলার কথা আছে এবং আস্তে আমীন বলার কথাও আছে। যদি জোরে আমীন বলা হয়, তাহলে আস্তে আমীন বলার হাদীসের উপর আমল হয় না। এজন্য হানাফী মাযহাবের সমাধান হল, জোরে আমীন বলা জায়েয, আর আস্তে আমীন বলা সওয়াব। আমরা কোনটি করব। জায়েযের উপর আমল করব, না সওয়াবের উপর আমল করব?

লা-মাযহাবীরা এখানে জিদ ধরেছে, আমরা জায়েযের উপর আমল করব। আমি বলি, হাদীসে আছে বিবি তালাক দেয়ার কথা, এটা জায়েয। আর বিবিকে নিয়ে ঘর-সংসার করার কথা, এটা সওয়াবের কাজ। সুতরাং তোমরা যারা মসজিদে এসে সওয়াব বাদ দিয়ে জায়েযের উপর আমল কর, তারা ঘরে গিয়ে সওয়াব বাদ দিয়ে জায়েযের উপর আমল করে বিবিকে তালাক দিয়ে দাও! অতএব এদের হাদীস মানার দোহাই শুনে ধোঁকায় পড়বেন না।

এগুলো হল আমল সম্পর্কে খুটিনাটি বিষয়। তাদের আসল সমস্যা আমলে নয়, আসল সমস্যা আক্বীদায়। তারা সর্বদা এ কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানে থাকেন, নীচে দুনিয়াতে থাকেন না। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলা আসমান, যমীন, সর্বত্রই বিরাজমান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে গায়েব নন, সর্বত্রই বিরাজমান।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا.

অর্থাৎ তোমরা কোন অনুপস্থিত ও বধিরের নিকট দু'আ করছ না।

সুতরাং তাদের আকীদা মনগড়া, কুরআন সম্মত নয়। তাদের আকীদা হাদীস সম্মতও নয়। কারণ হাদীসে এসেছে,

الأنبياء احياء في قبورهم.

অর্থাৎ নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত। কিন্তু লা-মাযহাবীরা বলে, নবীগণ স্বীয় কবরে মৃত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, নবীগণ স্বীয় কবরে জীবিত। আর ওরা বলে মৃত। সুতরাং তাদের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য মাযহাবের আলেমের ফতোয়া মেনে চলতে হবে।

কোন দেশের মুসলমান কোন মাযহাব মানবে, তার সমাধানও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. কে যখন ইয়ামান দেশের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়ামান বাসীদের সমস্যার সমাধান তুমি কিভাবে দিবে? তখন তিনি বলেছিলেন, কুরআনের মাধ্যমে। জিজ্ঞাসা করলেন, যদি কুরআনে না পাও, তাহলে? বললেন, হাদীস দ্বারা সমাধান দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি হাদীসেও না পাও তাহলে? তখন তিনি বললেন, যদি কুরআন-হাদীসেও না পাই তাহলে কুরআন-হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করে বের করব। এটাই হল ইসলামী সমাধান বের করার পদ্ধতি।

এখন বলুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার ইজতিহাদ করা সমাধান ইয়ামানবাসীর পালন করার ব্যবস্থা করলেন? মুআযের। ইয়ামান বাসীর জন্য মক্কার ইমামের মাযহাব পালন করার ব্যবস্থা করেননি। ইয়ামান বাসীর জন্য মদীনার ইমামের মাযহাব পালন করার ব্যবস্থা করেননি। ইয়ামান বাসীর জন্য মু'আযের মাযহাব পালন করার ব্যবস্থা করে দিয়ে রাসূল শিক্ষা দিলেন, যে দেশে যে ইমামের মাযহাব চালু আছে সে দেশের সাধারণ মুসলমান ঐ ইমামের মাযহাব মেনে চলবে।

এখন বলুন, বাংলাদেশে কোন মাযহাব চালু আছে? হানাফী মাযহাব চালু আছে। সুতরাং এখানে শাফিয়ী মাযহাবের দলীল আলোচনা করাও একটা ফিতনা। হ্যাঁ! যারা সব মাযহাব জানতে চায় এবং হাদীসের ক্লাসের ছাত্র, শুধু তাদের সামনেই আলোচনা করবেন। হানাফী মাযহাবের দলীল এটা, ইমাম শাফিয়ী রহ. এর দলীল এটা ইত্যাদি। সুতরাং যে দেশে যে মাযহাব চালু আছে সে দেশে সে মাযহাবেরই হাদীস আলোচনা করতে হবে। এর বিপরীত হাদীস মানা ও আলোচনা করা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।

এবার বলুন, সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমি আজ ইসলামের বিধি-বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম' কত ঠিকানায় পাওয়া যাবে? চার ঠিকানায়। কুরআনে, হাদীসে, উম্মতের ইজমায়, ইমামগণের ইজতিহাদে। সুতরাং যারা বলে, কুরআন মানি, হাদীস মানি অন্য কিছু মানি না, তারা কুরআনে অর্ধেক মানে আর অর্ধেক মানে না। যদি পরিপূর্ণ কুরআন মানতে হয়, তাহলে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসে যে সকল বিধান পাওয়া যাবে তার পুরোটাই মানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সকল বিষয় অনুধাবন করার এবং লা-মাযহাবীদের ফিতনা থেকে বাঁচার তওফীক দান করেন। আমীন।

অনুলিখন, মাওলানা জহির রায়হান
পরিমার্জন, মাওলানা মাকসূদুর রহমান

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... *অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)*

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-৬

গত সংখ্যার আগের সংখ্যায় এ কলামে লিখেছিলাম এক জামালুদ্দীন (ছদ্মনাম)-এর কাহিনী। সে কাহিনী ছাপার পরপরই কোন একদিন আমার এক ঘনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী আলহাজ্জ জয়নাল ভাই শোনালেন আরেক জামালুদ্দীনের কাহিনী। ঘটনা শুনলে মানতে হবে তিনি জামালুদ্দীন নন; তার বড় ভাই। সম্পর্কে আমাদের জয়নাল ভাইয়ের গ্রাম্য ভতিজা। স্কুল যামানা থেকে জয়নাল ভাইকে কাকা বলে ডাকেন। ভাতিজারা তিন ভাই তিন বোন। সকলেই স্কুল, হাইস্কুল শেষ করে কলেজ পাস করা। বোনদের কারো বিয়েই চল্লিশের আগে হয়নি। কদিন আগে ছোট বোনটির বিয়ে হয়েছে পঁচিশ বছরের এক ছেলের সঙ্গে। সব ক'টি বোন নিঃসন্তান। এদিক থেকে বংশের চাকা এখানেই থেমে গেছে। ভাইদের মধ্যে এই ভাতিজাটি মেজো। ভাইদের কারো বিয়েই যথাসময়ে হচ্ছিল না। বিশেষ করে বোনদের যথাসময়ে বিয়ে না হওয়াও ছিল একটি কঠিন বাধা। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে বড় ভাইয়ের বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হল। ইতোমধ্যে তাকে দিল কুকুরে কামড় । আর এতেই ঘটলো যতো বিপত্তি। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না হওয়ায় তিনি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হলেন এবং বিয়েবিহীন অবস্থায়ই পৃথিবী ত্যাগ করলেন।

এবার ভাতিজার নিজের বিয়ের পালা। একদিকে বয়স বেশি, অপরদিকে ভালো কোন চাকুরিও নেই। ফলে বিয়ে ঠিক করতে করতেই ক্ষয় হল অনেক জোড়া জুতোর তলা। অবশেষে বিয়ে ঠিক হল এবং একসময় বিয়ে হয়েও গেল। কিন্তু বাসর রাত থেকেই স্ত্রীর শরীরে ভীষণ জ্বর। স্বামী মনে করেছিল, গায়েহলুদের দিন সঙ্গী-সখীরা হয়তো বেশি মাত্রায় পানি ঢেলেছে, তাই ঠাণ্ডা লেগেছে; সামান্য চিকিৎসায়ই সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক দিন পরও যখন জ্বর নামল না; বরং শরীরের হলদে ভাব বেড়ে গেল এবং ধীরে ধীরে নববধূর চোখ, জিহ্বাও হলুদ বর্ণ ধারণ করল– এবার সে চিন্তিত হয়ে পড়ল যে, এ আবার কেমন গায়েহলুদ! দিনকে দিন যার হলদে আভা বৃদ্ধিই পাচ্ছে! অবশেষে সন্দেহ হল, এটা গায়েহলুদের হলুদ নয়; জন্ডিসের হলুদ! চেকআপ করিয়ে জানতে পারল, তার স্ত্রীর লিভার হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অকেজোপ্রায় হয়ে গেছে। এখন এ নতুন সংসার উজাড় হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। হলও তাই। নতুনত্ব কাটতে না কাটতেই স্ত্রীর ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

একজন নববিবাহিত পুরুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্ত্রীর এমন করুণ বিদায় তার হৃদয়কে কেমন ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে ভুক্তভোগী ছাড়া কারও পক্ষে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়। ভাতিজার সংসার-চিন্তা আপাতত এখানেই শেষ।

এবার ছোট ভাইয়ের পালা। তো বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে ফ্যামিলি-ব্যাকগ্রাউন্ডের বিষয়টি সামাজিকভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও অবহেলার বিষয় নয়। এ পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ড তো অদূরবর্তী সকলেরই জানা হয়ে গেছে। কাজেই চেনা-জানার মধ্যে ভালো কোন পরিবারের মেয়ে পাওয়া সম্ভব নয়– এটা ধরে নিয়েই মেয়ে খোঁজা শুরু হল। অবশেষে সম্ভবত একটু দূরে গিয়েই আত্মীয়তা স্থির হল। নির্ধারিত তারিখে আক্দও হয়ে গেল। শুরু হল ছোট ভাইয়ের দাম্পত্য জীবন । অল্প দিনের মধ্যেই নিকটবর্তীদের এবং কয়েকদিন পর অন্যদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠল, মেয়েটির মানসিক সমস্যা আছে। জয়নাল ভাইয়ের ভাষ্যমতে আধ-পাগলী। এতদসত্ত্বেও এ নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য নেই। বরং এটাকেই গনীমত ভেবে স্বামীসহ সকলে আল্লাহর দরবারে শোকর গোজারীর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অপরদিকে ভাতিজা জামালুদ্দীন (ছদ্মনাম) অনেক জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে ভালো কোন চাকুরি না পেয়ে শেষে বিআরটিসি বাসের টিকিট বিক্রয়ের চাকুরিতে যোগ দিয়েছে। নিজের সংসার নেই, কাজেই ছোট চাকুরিতে জীবন তার ভালোই কাটতে লাগল। আস্তে আস্তে মনের ক্ষতও শুকাতে থাকল।

এভাবে কিছুদিন কাটার পর বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহ পেয়ে মনের মধ্যে পুনরায় সংসার গড়ার স্বপ্ন উঁকি দিতে শুরু করল। সংসারচিন্তা যখন চতুর্দিকে ডাল-পাতা ছড়িয়ে পূর্ণতায় রূপ নিল তখন ঢাকার এক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা ভদ্র মহিলার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল। কিছুদিন পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটি কন্যা সন্তান দান করলেন। আদর করে তারা তার নাম রাখল 'মুন' (চাঁদ)। ঢাকায় ভাড়া বাসা, স্বামীর অল্প বেতনের চাকুরি, কাজেই স্ত্রী সরকারী চাকুরি ছেড়ে দিয়ে শুধু গৃহিনী হয়ে সন্তান-সংসার নিয়ে পড়ে থাকবে এটা কল্পনায়ও আসেনি। মোটকথা, বাবা-মা দু'জনই চাকুরি করে। বেতন তাদের এমন বেশি নয় যে, একাধিক আয়া-বুয়া রেখে সন্তানের জন্য মাতৃস্নেহের বিকল্প তৈরি করে দিবে। এমন সংসারে বাবা-মা কত কষ্ট করে যে সন্তানটিকে লালন করেছে তা আন্দাজ করা মুশকিল।

মেয়ে বড় হচ্ছে। স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। এখন সে এগারো বছরের এক চঞ্চলমতি দুরন্ত বালিকা। বাসায় থাকলে প্রতিবেশীদের মাতিয়ে রাখে। আর স্কুলে সহপাঠীদের প্রাণবন্ত রাখে। বাবা-মা কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে সন্তানের সান্নিধ্যে তার সামান্য চঞ্চলতায় ডিউটির সকল ক্লান্তি অবসাদ ভুলে যায়।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের কোন একদিন। বাসার সিঁড়িতে সাথীদের কারো সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে মেয়েটি মাথায় আঘাত পায়। আঘাত গুরুতর মনে হওয়ায় বাবা-মা চিকিৎসার জন্য মেয়েকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার সাহেব তাৎক্ষণিক তার হার্টের এক্স-রে করিয়ে কোন সমস্যা না পেয়ে কিছু ব্যথার ওষুধ দিয়ে রিলিজ করে দেয়। ওষুধ সেবন করে মনে হল

অসুবিধা কেটে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে ক্রমেই অবস্থা খারাপের দিকে যেতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর পর সে খিচুনীর শিকার হয়, আবার এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। অবশেষে সে বছরই ২৭ নভেম্বর পুনরায় তাকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হল। ভাগ্যক্রমে দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। বড় ডাক্তাররা সকলে চলে গেছেন। পরপর দুটি দিন ছুটি থাকায় তিনদিন প্রায় চিকিৎসাবিহীন কাটল। জটিল রোগী হওয়ায় ডিউটিরত ডাক্তাররা কেউ চিকিৎসা দেয়ার সাহস করেনি। রোববার যখন প্রফেসরগণ দেখতে আসলেন, তখন রোগীর অবস্থা চরমে পৌঁছে গেছে। সাথে সাথে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হল। আঘাত ছিল মাথায়। তা সত্ত্বেও সিটি স্ক্যান না করিয়ে বুকের এক্স-রে করিয়ে ছেড়ে দেয়ায় পূর্বের ডাক্তার সাহেবকে বড়রা কতক্ষণ ভৎর্সনা করলেন। তড়িৎ মস্তিষ্কের সিটিস্ক্যান করানো হল। ততক্ষণে রোগী কোমায় চলে গেছে। তাকে লাইফ সাপোর্ট দিতে হল। অবস্থার আর উন্নতি হল না। ডাক্তারগণ আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন মেয়েটি এখন ক্লিনিক্যালি ডেড; লাইফ সাপোর্ট খুলে দিলেই কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বাবা-মা লাইফ সাপোর্ট খুলতে দিবে না। তারা এগারো বছর ধরে এত কষ্টে লালিত একমাত্র কন্যা সন্তানটিকে কিছুতেই মৃত দেখতে প্রস্তুত নয়।

জয়নাল ভাই আমার কাছে মাসআলা জানতে চাইলেন যে, এমন পর্যায়ে রোগীকে লাইফ সাপোর্টে রেখে দেয়ার শরয়ী বিধান কি? আমি বললাম, ডাক্তারীমতে মৃত ঘোষণার পর লাইফ সাপোর্টে রাখার অর্থ কাফন-দাফনে বিলম্ব করা এবং অযথা টাকা খরচ করে লাশ পাহারা দেয়া। কাজেই শরীয়তমতে এটা জায়েয নয়। আপনারা বাবা-মাকে বুঝিয়ে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করুন। অবশেষে একরকম চাপ প্রয়োগ করেই ৪ঠা ডিসেম্বর লাইফ সাপোর্ট খুলে লাশ নিয়ে বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। খবর পেয়ে গ্রামের আত্মীয়-স্বজন তাদের বাড়ীতে আসা শুরু করেছে। কবর খননের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে 'মুনে'র বৃদ্ধা দাদী এতদিন খবর শুনেছে নাতনীর চিকিৎসা চলছে, আজ বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা দেখে জিজ্ঞেস করছে, 'মুন' কি তাহলে মারা গেছে? কিন্তু কেউ তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলছে না। কারণ সঠিক উত্তরের ধাক্কাটি তিনি সামলাতে পারবেন না। পরে না আবার একসাথে দু'টি কবরই খুঁড়তে হয়! অবশেষে লাশ যখন বাড়িতে পৌঁছল, তখন তো আর দাদীর কাছ থেকে লুকানো সম্ভব নয়। দাদী দেখলেন, তাদের আদরের ধন 'মুন' অস্তমিত আলোহীন। এবার সকলের আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিতে দেরী হল না। দাদী সংজ্ঞা হারালেন। তবে তখনও হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়নি। দাদীকে এ অবস্থায় রেখে সকলে নাতনীর গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফন সেরে নিল।

অতঃপর সকলে দাদীর প্রতি মনোযোগী হল। একদিন পার হয়ে গেল তার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এবং স্থানীয় চিকিৎসায় কোন কাজ হল না। অবশেষে ঢাকায় নিয়ে আসবে কি না এ মর্মে ভাবতে ভাবতে দু'দিনের মাথায় দাদীও নাতনীর অনুগামী হয়ে গেলেন.....। ইন্নানিল্লাহি.....। আল্লাহ তা'আলা দাদী-নাতনী দু'জনকেই জান্নাতী নিদ্রায় নিদ্রিত রাখুন। জয়নাল ভাইয়ের ভাতিজা দু'দিনের ব্যবধানে এগারো বছরের কিশোরী 'মা' আর অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা দু'জনকে মাটির গর্ভে সঁপে দিয়ে নিস্তব্ধ ও নির্বাক। এ কাহিনী বাহ্যত সম্পূর্ণ হতভাগ্য জীবনের এক করুণ প্রতিচ্ছবি, যা ব্যর্থ জীবনালেখ্যর কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ঈমানদারের জীবন এরপরও ব্যর্থ নয় এবং নয় সে হতভাগা। ঈমানদারের মূল জীবন তো পরকালের জীবন। ধৈর্যের সাথে মানিয়ে নিতে পারলে আর আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী না হলে এ জাতীয় ব্যর্থতা ও বঞ্চনা পরকালে তাকে দান করবে ঈর্ষণীয় সাফল্য। এ সন্তান তার বাবা-মাকে না নিয়ে একা একা জান্নাতে যাবে না। এ সন্তানের মৃত্যুতেও আল্লাহর প্রশংসা করে ধৈর্যধারণের ফলে বাবা-মায়ের জন্য জান্নাতে 'বাইতুল হামদ' নামক মহল তৈরি করা হবে। প্রতিটি বিপদে ধৈর্য ধারণের বদৌলতে সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। দুনিয়ার জীবন তো দুঃখে-সুখে সকলেরই কেটে যাবে। কিন্তু পরকালে দুঃখী হলে তো সে দুঃখের সীমা-সরহদ কল্পনা করার সাধ্যও আমাদের নেই। সেখানের সুখই আসল সুখ, সেখানের দুঃখই আসল দুঃখ।

ঈমানদারের জন্য একালের ক্ষণস্থায়ী অনেক কিছু হারালে সেকালের চিরস্থায়ী অনেক কিছু অর্জন করা অধিক সহজ হয়ে যায়। শর্ত হল ধৈর্য। আর ধৈর্যের অর্থ ব্যথিত না হওয়া নয়; বরং বিপদকে আল্লাহর তরফ থেকেই এসেছে ধরে তার কাছ থেকে সওয়াবের আশা রাখা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করা।

এ রকম ধৈর্যের জন্য আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের সংস্পর্শ আবশ্যক। বুযুর্গদের সংস্পর্শে দীক্ষিত হলে সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় অন্তর স্থির থাকে। বাহ্যিক অশান্তিতেও আত্মায় শান্তি থাকে। আর আত্মার শান্তিই প্রকৃত শান্তি।

আবু তামীম

কাফেরদের চক্রান্ত, জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ, কোয়ান্টাম মেথড, শিয়া-কাদিয়ানীদের মত বর্তমানের ভয়ঙ্কর সব ঈমান বিধ্বংসী ফিতনা থেকে এবং দীনের নামে বদদীনী, ইসলামের নামে কুফরী, ইবাদতের নামে বিদআত থেকে নিজেকে এবং মুসলমান জাতিকে বাঁচাতে আজই সংগ্রহ করে পড়ুন। **শাইখুল হাদীস হযরত মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.** রচিত

ইশাআতুস সুন্নাহ

লেখকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরো কিছু কিতাব-

মাযহাব ও তাকলীদ # তুহফাতুল হাদীস # আমালুস সুন্নাহ # কিতাবুস সুন্নাহ # কিতাবুল ঈমান # ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস #

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল মানসূর, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

লেখকের ওয়েবসাইট : www.darsemansoor.org

গ্রন্থ পরিচিতি

মুফতী মনসূরুল হক দা. বা. লিখিত

ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস

মাওলানা সাঈদুয্যামান

লেখক পরিচিতি : হযরতুল উসতায শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম ইলমী আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার অনন্য দিকনির্দেশনায় দুনিয়া-আখেরাতের মহাঅভিযাত্রায় প্রতিনিয়ত নিরাপদ মনযিলের সন্ধান পাচ্ছে হাজারো উলামা-তৃলাবা ও জনসাধারণ । তার প্রতিটি দিনের প্রতিটি লহমা উম্মাহর খেদমতে সদা কুরবান। যৌবনে হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. ও হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ধন্য হয়েছেন হযরত মুহাদ্দিস সাহেব, মুফতী আব্দুল মুঈয সাহেব, মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেবদের (রাহিমাহুমুল্লাহ) ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধদের শিষ্যত্ব অর্জন করে। তাঁর ইলমী খিদমতের সূচনাও এমন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে হয়েছে, যারা ছিলেন ইলমী প্রেরণায় উজ্জীবিত আকাবির-আসলাফদের প্রতিচ্ছবি; হুবহু নমুনা। সুলূক ও তাযকিয়ার পথেও তিনি অগ্রজ। থানবী কাননের আখেরী গোলাব মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী রহ. এর তিনি সুযোগ্য খলীফা। এশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকার সর্বত্র তাঁর রূহানী সন্তানেরা দীনের প্রচার প্রসারে নিয়োজিত। মক্তবের চাটাই থেকে হাদীসের মসনদ সবখানেই তার তালাবাদের জয়জয়কার। ইসলামের জন্য নিজেকে বিলীন করে দেয়ার এক অকুতোভয় সিপাহসালার হযরত মুফতী সাহেব দা.বা.। কখনো দরসের মসনদে, কখনো বয়ানের মিম্বরে, কখনো কিতাবের পাতায় নির্ভয়ে নিঃসঙ্কচো উম্মাহকে পৌঁছে দিচ্ছেন প্রিয় নবীজির পবিত্র আমানত। হযরতের বয়ান নিয়মিত সংরক্ষিত হচ্ছে www.darsemansoor.org -এ । তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *কিতাবুল ঈমান*, *ইসলামী যিন্দেগী*, *ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস*, *কিতাবুস সুন্নাহ*, *আমালুস সুন্নাহ*, *তুহফাতুল হাদীস* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা হযরতুল উস্তাযকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করুন। তাঁর সকল দীনী খিদমাতকে কিয়ামত পর্যন্ত বাকী রাখুন এবং আমাদেরকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।

গ্রন্থ পরিচিতি

ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায় সংবলিত।

প্রথম অধ্যায় : যুগে যুগে ইয়াহুদী-খ্রিস্টচক্রের ষড়যন্ত্র, হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাত ও তৎকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কীর্তিগাঁথা শাসনামল সম্পর্কে।

তৃতীয় অধ্যায় : কারবালার সঠিক ইতিহাস প্রসঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায় : সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এবং তাঁদের সমালোচনা ও দোষচর্চার শরয়ী বিধান সম্পর্কে।

পঞ্চম অধ্যায় : বর্তমান প্রেক্ষাপট; ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ প্রসঙ্গে।

গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা

হযরতুল উস্তায এই গ্রন্থে পাঠকদের সামনে ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত কোন জাতির ইতিহাস সে জাতির দর্পণ। মানবজাতির ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত, তার প্রতিটি শ্বাস-নিঃশ্বাস, চিন্তা-চেতনার প্রতিটি গলি-ঘুপচি সবই ইতিহাস আশ্রিত। ইতিহাসবিহীন জাতি যেন শেকড়হীন বৃক্ষ। যে কোন মুহূর্তে তার মুখ থুবড়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। না সে ফল দিবে, না তার ঘ্রাণ ছড়াবে। আর সজীবতা নিয়ে বেঁচে থাকা তো পরের কথা। ইতিহাসবিহীন জাতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। না থাকবে তাদের কোন ঐতিহ্য, না তারা রাখতে পারবে সাফল্য ও যোগ্যতার স্বাক্ষর। অতীতের উত্থান-পতন সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যতকে ঘোর অমানিষায় নিক্ষেপ করবে। সে হিসেবে ইতিহাস অধ্যয়ন, ইতিহাস বিশ্লেষণ ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস ধারণ ও সংরক্ষণ প্রতিটি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী জাতির অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

কিন্তু এ কর্তব্য পালনে কেউ যদি প্রান্তিকতার শিকার হন অথবা সৎসাহস হারিয়ে কিংবা বিদ্বেষ বশত কারো কলম যদি সাদাকে কালো বা কালোকে শোভনীয় করে তোলে তাহলে তা ভবিষ্যত প্রজন্মকে চরম হুমকির দিকে ঠেলে দিবে। অধঃপতন তখন অনিবার্য হয়ে দেখা দিবে।

প্রিয় পাঠক! ইসলামী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও ভালো-মন্দ, কালো-সফেদ সব রঙের কলমেরই ব্যবহার হয়েছে। প্রান্তিকতার শিকার বা বিদ্বেষের অনুগামী ঐতিহাসিকেরা ইয়াহুদী কুচক্রীদের বানোয়াট ইতিহাসের অনুকরণে বিন্দুমাত্র লাজ-লজ্জা বোধ করেনি। ইসলামের চিরশত্রু ও অভিশপ্ত ইয়াহুদী জাতি রাসূলের যুগেই মুনাফিকের মুখোশ পরে মুসলমানদের মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। ঠিক তেমনি সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইবনে সাবা ও তার অনুচররা নেককার মানুষের বেশ ধারণ করে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে উঠেপড়ে লেগে যায়। এই নাপাক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা উম্মাহর দলীল-প্রমাণ, আশা-ভরসা ও ভক্তি-ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল সাহাবায়ে কেরামের নামে বানোয়াট সব অভিযোগ বাজারজাত করে দেয়। সাদাদিল অনেক ঈমানদার তাদের সে ঘৃণ্য প্রোপাগাণ্ডার শিকার হয়ে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করত ঈমানহারা হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। তৎকালীন ও পরবর্তী প্রত্যেক যুগের হক্কানী উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ লিখনীর মাধ্যমে ইবনে সাবা ও তার দোসরদের সকল অভিযোগ ও প্রোপাগাণ্ডার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে উম্মাহর ঈমানকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। নিকট অতীতে স্বশিক্ষিত ও স্বঘোষিত এক মুজতাহিদও ইবনে সাবার এজেন্ডা বাস্তবায়নে বই-পুস্তক লিখে মুসলিম সমাজে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ফেরি করেছেন। আলোচ্য পুস্তকটি হযরত মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম মূলত ঐ ফেরিওয়ালার হাত থেকে উম্মাহকে রক্ষা করার মানসে রচনা করেছেন। যা উম্মাহর প্রতি তার কর্তব্যবোধ ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন।

হযরত মুফতী সাহেব দা. বা. এ পুস্তকে সাহাবায়ে কেরামের কোন অবহেলা বা

দোষ-ত্রুটির ফলে নয়, বস্তুত ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ও তাদের দোসরদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে ইসলামী খিলাফত ধ্বংস হয়েছে তার প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন। কিতাবটি থেকে তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলঃ

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হযরত উসমান রাযি. এর ওপর ইবনে সাবা ও তার (অতীত ও বর্তমান) মিত্ররা 'স্বজনপ্রীতি ও স্বীয় বংশীয় লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে অধিক সম্পদ প্রদান করা'র অপবাদ আরোপ করে।'

লেখক তার বইয়ের ৪৬-৪৮ পৃষ্ঠায় স্বয়ং হযরত উসমান রাযি. এর জবানবন্দীর মাধ্যমে তাদের এই অপবাদটির মূলোৎপাটন করেন। 'তিনি (হযরত উসমান রাযি.) স্বজনপ্রীতির কথিত অভিযোগের উত্তরে বলেন, 'তারা অভিযোগ করে থাকে– আমি আমার আপনজনদের অধিক ভালবাসি এবং তাদেরকে অধিক দিয়ে থাকি। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আপনজনদের সঙ্গে আমার স্বাভাবিক ভালবাসা আছে বটে, কিন্তু কোন অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের পক্ষ সমর্থন করি না। বরং তাদের প্রাপ্য হক তাদের নিকট পৌঁছে দেই মাত্র। আর তাদের যে অধিক দিয়ে থাকি তা আমার ব্যক্তিগত ও নিজস্ব সম্পদ হতে দিয়ে থাকি। মুসলমানদের সম্পদ তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারকে আমি আমার জন্য এবং আমার আত্মীয় বা নিজস্ব কোন ব্যক্তির জন্য হালাল মনে করি না।' তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'আমি যখন খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলাম তখন আমি আরবের সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলাম। আরবের সবচেয়ে বেশি উট-বকরী আমার ছিল। বর্তমানে আমার হজ্জের জন্য রক্ষিত দুটি উট ছাড়া অতিরিক্ত একটাও উট বা বকরী নেই। সবকিছু আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি।' হযরত উসমান রাযি. স্বীয় উক্তির পর মদীনাবাসীদের সাক্ষ্য চাইলেন। 'এটাই কী প্রকৃত অবস্থা নয়? তারা সকলে এক বাক্যে আল্লাহকে হাযির নাযির উল্লেখ করত বললেন, 'হ্যাঁ! এটা বাস্তব সত্য।'

কুখ্যাত সাবায়ীদের আরো একটি অভিযোগ ছিল 'সরকারী চাকুরীতে অধিকহারে আত্মীয়-স্বজনকে নিয়োগ দেয়া'।

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ৪৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, 'অপবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য হযরত উসমানের রাযি. খিলাফতকালের ৪৭ জন গভর্নরের নামের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অতি সহজেই এর উত্তর পাওয়া যায় যে, উক্ত ৪৭ জন গভর্নরের মধ্যে মাত্র ৫ জন হযরত উসমান রাযি. এর আত্মীয় ছিলেন। তন্মধ্যে ৩ জন ছিলেন তার নিজ বংশ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্র কুরাইশের শাখা উমাইয়া গোত্রের। কিন্তু এই ৩ জনের মধ্যে ২ জনই ছিলেন হযরত উমর রাযি. কর্তৃক নিযুক্ত। উক্ত ৫ জনের মধ্যে অপর ২ জন হযরত উসমান রাযি. এর আত্মীয় ছিলেন বটে, কিন্তু আত্মীয়তার দূরত্ব অনুধাবনে জ্ঞানীমাত্রই বলতে বাধ্য হবেন যে, এত দূরের আত্মীয়তা অভিযোগের কারণ হতে পারে না। বরং হযরত উসমান রাযি. কে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করার জন্যই কেবল এ ধরনের কথা উত্থাপন করা হয়েছিল। নতুবা শুধু আত্মীয়তার খাতিরেই হযরত উসমান রাযি. কাউকে গভর্নর নিয়োগ করেননি।'

প্রিয় পাঠক! উক্ত বিবরণে নিশ্চয় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ষড়যন্ত্রকারী সাবায়ীরা হযরত উসমান রাযি. এর উপর কতটা ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বা তিক্ত বাস্তবতা হল, কতক সাবায়ী মতাদর্শের ঐতিহাসিকরা নিঃসঙ্কোচেই হযরত উসমান রাযি. কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। অথচ বাস্তবতা হল তিনি সর্বপ্রকার কলুষ মুক্ত ছিলেন।

হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু

হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফতকালে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কুচক্রী সাবায়ী দলকে নির্মূল করার মত মহৎ ও পুণ্যময় কাজ যিনি আঞ্জাম দিয়েছেন, তিনি হলেন হযরত মুআবিয়া রাযি.। স্বার্থান্বেষী সাবায়ী ও তাদের অনুচর ঐতিহাসিকরা তাঁকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় 'রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা' আখ্যা দিয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন রাসূলের একজন মহান সাহাবী, তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী ও কাতেবে ওহী বা ওহী লিপিবদ্ধকারী।

রাসূলের এত প্রিয়, বিশ্বস্ত ও মর্যাদাবান সাহাবীর উপর আরোপিত অপবাদের জবাবে লেখক ৮৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, 'তিনি (হযরত মুআবিয়া রাযি.) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও সন্ত্রাসবাদী সাবায়ীদের দমন করে রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের ক্ষতির প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রথম সারির ভুক্তভোগী হিসেবে তিনি যোগ্য উত্তরসূরী মনোনয়নপূর্বক নিজের জীবদ্দশায় তার হাতে জনসাধারণের বাইআত নিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। যাতে তার মৃত্যুর পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে শত্রুদের ষড়যন্ত্রে বা অন্য কোন কারণে পুনরায় মুসলিম জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টির কোন অবকাশ না থাকে'

এই মানসে তিনি বিভিন্ন গভর্নর বরাবর চিঠি লিখেন, যার সারাংশ হল-

জনসাধারণকে আমি রাখালবিহীন বকরীর পালের মত ছেড়ে যেতে চাই না। হযরত মুআবিয়া রাযি. এর পত্রের জবাবে কুফা নগরীর গভর্নর হযরত মুগীরাহ বিন শু'বাহ রাযি. খলীফাপুত্র ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করার পরামর্শ দেন। কারণ হিসেবে তিনি হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাতের পর সাবায়ীদের ষড়যন্ত্র, মুসলমানদের মাঝে ঘটে যাওয়া মতানৈক্য ও ভয়াবহ রক্তপাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সেই সময় পর্যন্ত তাঁর দেখা ইয়াযীদের যোগ্যতার স্বীকারোক্তিও দেন।

গ্রন্থকার ৮৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, 'বলাবাহুল্য, ইয়াযীদ আমীরুল মুমিনীনের প্রিয় পুত্র ও সাহাবীযাদা হিসেবে গোটা ইসলামী উম্মাহর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তার নৈতিকতা, ধার্মিকতা, পারিবারিক সম্ভ্রম, প্রশাসনিক দক্ষতা ও একাধিক সমর নৈপুণ্যের বিচারে তিনি খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। স্বয়ং হযরত মুআবিয়া রাযি. তাকে বিশিষ্ট সাহাবীগণের উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী খারেজীদের দমনে এবং তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে প্রেরণ করে তার সাহসিকতা ও সমর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর অবলোকন করেন।' তাই এ অবস্থার প্রেক্ষিতে চারদিকে প্রচারণার ফলে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহের প্রতিনিধি দল এসে হযরত মুআবিয়া রাযি. কে ইয়াযীদের মনোনয়নের ব্যাপারে অনুরোধ জানাতে থাকেন। তখন হযরত মুআবিয়া রাযি.-ও ভেবেচিন্তে স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে মনোনয়ন দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে এটাকে রাজতন্ত্র ভাবার কোন সুযোগ নেই। কারণ, রাজতন্ত্র বলা হয় যোগ্যতার বিচার না করে শুধু বংশানুক্রমিক শাসন ধারাকে।

এতদসত্ত্বেও হযরত মুআবিয়া রাযি. জুমুআর এক খুতবায় আসমানের দিকে তাকিয়ে এই দু'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করেই যদি আমি ইয়াযীদকে মনোনীত

করে থাকি, তাহলে তার পক্ষে আমার এ সিদ্ধান্তকে পূর্ণতা দান কর। পক্ষান্তরে পুত্রের প্রতি পিতার মোহ-ই যদি হয় এর কারণ, তাহলে তা তুমি ব্যর্থ করে দাও।' বলাবাহুল্য, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মোহ যদি তার থাকত তাহলে দু'আ কবুলের মুহূর্তে খুতবার মাঝে এ দু'আটি তিনি কখনো করতে পারতেন না।

কিন্তু ইয়াযীদের শাসনামলে কুফা নগরীর গভর্নর কুখ্যাত ইবনে যিয়াদ কর্তৃক কারবালা প্রান্তরে রাসূলুল্লাহর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হুসাইন রাযি. এর মর্মন্তুদ শাহাদাতের ঘটনাকে পূঁজি করে এর সকল দায়ভার যারা হযরত মুআবিয়া রাযি. এর উপর চাপিয়ে দেন এবং তাকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাল্পনিক অভিযোগে অভিযুক্ত করেন, বস্তুত তারা নিজেদের ঈমানকেই হুমকির মুখে ঠেলে দেন।

গ্রন্থকার সাহাবীগণের সমালোচনাকারী ও তাদের ব্যাপারে সঙ্কীর্ণমনাদের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট সতর্কবাণী উল্লেখ করেন, 'আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর! আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে। আমার পরে তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিয়ো না। যে আমার সাহাবীগণকে ভালোবাসে সে আমার মুহব্বতেই তাদেরকে ভালোবাসে। আর যে আমার সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখার দরুণই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬৭৩)

প্রিয় পাঠক! কুখ্যাত ইহুদীদের ষড়যন্ত্র শুধু সেই যুগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং আজো বলবৎ আছে। মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপকৌশলে আজো তারা মত্ত। হযরতুল উস্তায সাহাবায়ে কেরামের সমালোচকদের জবাবের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তৎসঙ্গে আজকের মুসলমানদের জন্য করণীয় বিষয়গুলোও যুক্ত করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাঁদের হক জানা ও আদায় করা ঈমানের দাবী। গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের ১৩৭-১৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাঁদের হক সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন। সংক্ষেপে তার শিরোনামগুলো উল্লেখ করা হল।

১. তাঁদের নাম শোনা মাত্রই 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন' পড়া।

২. তাঁরা সকলে ন্যায় পরায়ণতা ও ইনসাফের উপর কায়েম ছিলেন তা বিশ্বাস করা।

৩. তাঁদের সকলকে সম্মানের নজরে দেখতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

৪. সাহাবায়ে কেরামকে মুহব্বত করা।

৫. তাঁদের অনুসরণ করা।

৬. তাঁদের সমালোচনা না করা।

৭. যারা সাহাবাদেরকে মুহব্বত করে তাদেরকে মুহব্বত করা। আর সাহাবাদের প্রতি যারা বিদ্বেষ রাখে তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা। এখানে তৃতীয় কোন পথ নেই। তৃতীয় পথ অবলম্বন করলে মুনাফিক হিসেবে গণ্য হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের হক বুঝার এবং তা আদায়ের তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: খতীব, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা।

মারকাযুল উলূম আশশারইয়্যাহ ঢাকা

(গবেষণামূলক উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

ওয়াশপুর টাওয়ার (বছিলা বুদ্ধিজীবি ব্রীজ সংলগ্ন), হাজারীবাগ (সাবেক মুহাম্মদপুর), ঢাকা

পৃষ্ঠপোষকতায়: ১. মুফতীয়ে আযম আল্লামা আব্দুস সালাম চাটগামী (দামাত বারাকাতুহুম)

২. ফকীহুল মিল্লাত মুফতী ইউসুফ তাওলভী দা.বা. মুফতী ও মুহাদ্দিস দেওবন্দ।

ইফতা বিভাগ-(মেয়াদকাল ১বছর)

* ইসলামী ফিকহ ও ইসলামী অর্থনীতির শিক্ষা প্রদান (বিশেষত আধুনিক বিষয়াদি, ফারায়েজ, ব্যাংকিং, বীমা, কোম্পানী, শেয়ার বাজার ও প্রচলিত এম.এল.এম ইত্যাদির উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ও শরয়ী সমাধানের প্রশিক্ষণ প্রদান)।
* অভিজ্ঞ মুফতীগণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক মাসিক মুযাযারা উপস্থাপন

* নূরানী বিভাগ (১ থেকে ২ বছর মেয়াদী মানসম্পন্ন নূরানী বিভাগ)
* হিফযুল কুরআন বিভাগ (১ থেকে ৩ বছর মেয়াদী আন্তর্জাতিক মানের হিফযুল কুরআন বিভাগ)
*কিতাব বিভাগ (উর্দূ নাহবেমীর শ্রেণি পর্যন্ত)

আদব বিভাগ-(মেয়াদকাল ১বছর)

* আরবী ভষা ও সাহিত্যের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।
* বিশুদ্ধরূপে আরবীতে অনর্গল কথপোকথনের যোগ্যতা অর্জন আরবীতে প্রবন্ধ, আবেদনপত্র ও চিঠিপত্র লেখার যোগ্যতা অর্জন।

ইফতা ও আদব বিভাগে ভর্তির যোগ্যতা

দাওরায়ে হাদীসে প্রথম বিভাগ/দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

ভর্তি পরীক্ষা: (ইফতা)

লিখিত : হেদায়া ৩য় খণ্ড ও নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)

মৌখিক: জামে তিরমিযী ১ম খণ্ড ও প্রাসঙ্গিক যেকোন বিষয়

সকল বিভাগের ভর্তি ৭ শাওয়াল থেকে ১৪ শাওয়াল (সকাল ৮টা-১২টা ও বিকাল ২টা-৫টা পর্যন্ত)

বি.দ্র. নূরানী ও কিতাব বিভাগে স্কুল ও কওমী মাদরাসা সিলেবাসের সমন্বয়ে গঠিত সিলবাসে পাঠদানের মাধ্যমে জেএসসি ও সমাপনি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়

আরযগুযার : মুফতী আব্দুর রহমান কাসেমী ০১৮৬৬৯৪৯৮০০, ০১৮৫৫৯০৭৭০০

ইসলামী বিবাহ ও রসম রেওয়াজ

আবু হাস্‌সান মুহাম্মাদ শামসুল হক রাহমানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাত্রী দেখা : শরয়ী রূপরেখা

ইসলামী শরীয়ত কোন ভিন নারীর প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতকে অনুমোদন করে না। তবে বিশেষ কিছু মুহূর্তে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে এর অনুমতি রয়েছে। বিবাহের প্রাক্কালে পাত্রী দেখার বৈধতার ক্ষেত্রেও ইসলামের রয়েছে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। যার সাথে আজীবন এক অটুট বন্ধন সৃষ্টি হবে, সুখে দুঃখে যে হবে জীবনসাথী, বিবাহের পূর্বে তাকে একনজর দেখে করে নেয়ার অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে, যেন পরবর্তীতে কোন অনুযোগ আফসোস না থাকে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة وان كانت لاتعلم

অর্থাৎ, যদি তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহলে শুধু বিবাহের উদ্দেশ্যে তাকে একটু দেখে নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও তার অগোচরে হয়। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৩৬০২)

পাত্রী দেখার বৈধতার ক্ষেত্রে আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে। তবে এখানে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল, পাত্র পাত্রীতে তখনই দেখতে পারবে যখন বিবাহের কথাবার্ত চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং মাহরাম মহিলাদের বর্ণনা মতে পাত্রীটি পাত্রের জন্য উপযোগী সাব্যস্ত হয় কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর। এখন শুধুমাত্র পাত্রের মানসিক প্রশান্তির জন্য পাত্রী দেখা। এটি হল বৈধতার গণ্ডি। কিন্তু কারো অভ্যাস যদি হয় শুধু একের পর এক পাত্রী দেখতে থাকা, তারপর বাজারের পণ্যের ন্যায় দেখা পাত্রীগুলোর মধ্যে বাছাই করে পাত্রী নির্ধারণ করা, তাহলে এ পদ্ধতি কখনোই শরীয়তসম্মত নয় এবং এটা ভদ্রতারও পরিপন্থি। অনেকের ক্ষেত্রে শোনা যায়, তিনি কয়েক ডজন মেয়ে দেখেছেন তার পরও তার পাত্রী পছন্দ হয়নি। এটা কেমন ভদ্রতা ও শিষ্টাচার! বিবাহের নামে নতুন নতুন পাত্রীগৃহের স্বাদ গ্রহণকারী এ সকল ব্যক্তিরা কি কখনো ভেবে দেখেছে ঐ পিতাটির কথা, যিনি বড় আশা করে ঘরে পাত্রপক্ষকে আহ্বান করেছেন। তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে ঐ অবলা নারীর কথা যে স্বপ্নের কত জাল বুনেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে দেখে যখন কোন পাত্রীকে অসম্মতি প্রদান করা হয় তখন সে ঘরে কি কেয়ামত ঘটে যায় তারা কি তা উপলব্ধি করতে পারে! অনেক মেয়ে তো প্রতিবেশীর প্রশ্নবাণের লজ্জায় অতঃপর গৃহবন্দী জীবন যাপন করে এবং নানা প্রকারের সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হয়। তাই পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মাহরাম নারীদের সহযোগিতা নেবে, তাদের বর্ণনায় পছন্দ হলে ছেলে পাত্রী দেখে নিবে।

পাত্রী দেখার বৈধতার ক্ষেত্রে আরো যে বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

পাত্রপক্ষ থেকে পুরুষদের মাঝে শুধুমাত্র পাত্র মেয়েকে দেখতে পারবে। পাত্রপক্ষের অন্য কোন পুরুষ পাত্রীকে দেখতে পারবে না, এমনকি পাত্রের বাবাও না।

পাত্র মেয়েকে দেখার সময় সে স্থানে পাত্রের মাহরাম নারী বা পাত্রীর মাহরাম পুরুষ উপস্থিত থাকবে। একান্তে পাত্রীকে দেখা বৈধ নয়। ঠিক তেমনি পাত্রী দেখার সময় পাত্রীর মা-খালা বা কোন যুবতী মেয়ে বা মহিলার সেখানে বেপর্দা অবস্থানও বৈধ নয়।

পাত্র শুধুমাত্র মেয়ের মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা দেখতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে না। চুল, মাথা বা অন্য কোন স্থান কাপড়বিহীন দেখতে পারবে না। অবশ্য কাপড়ের উপর দিয়ে দেহ উপলব্ধি করতে পারবে।

পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপ্রয়োজনীয় আলাপ ও গল্প-গুজব করতে পারবে না।

পাত্র-পাত্রী উভয়ে স্বাভাবিক সাজ-সজ্জা করতে পারবে। কিন্তু এমন মেকআপ করতে পারবে না যার দ্বারা বাস্তব অবস্থা লুকানো হয়। যেমন কালো মেয়ের মেকআপ দিয়ে তার রং ফর্সা করা বা হাইহিল জুতো পরে উচ্চতা লুকানোর চেষ্টা করা। ঠিক তদ্রুপ বয়স্ক পাত্র কালো খিযাব ব্যবহার করে যুবক সাজা। এ ধরণের ধোঁকাবাজী জায়েয নয়।

কনে দেখে তোহফা প্রদান জায়েয আছে; জরুরী নয়। উদাহরণত বই-পুস্তক, অলঙ্কার বা আংটি অথবা অন্য কোন বস্তু হাদিয়া দেয়া যেতে পারে। তবে একে অপরকে আংটি পরিয়ে দেয়ার যে প্রথা আছে তা জায়িজ নয়।

পাত্রী দেখার প্রয়োজনে শুধু পাত্র এবং বিবাহের আলাপের জন্য বংশীয় কিছু মুরব্বী পাত্রীগৃহে আগমন করবে। অধিক লোকের সমাগম বা এ উপলক্ষে মেয়ের বাড়ীতে বিশাল কোন অনুষ্ঠান শরীয়ত সম্মত নয়।

কাবিন বা এনগেজমেন্ট ও তৎপরবর্তী দেখা সাক্ষাত ও ফোনালাপ

ইসলামী বিবাহের পদ্ধতি হল উভয় পক্ষের সম্মতি ও কথা পাকাপাকি হওয়ার পর আকদ সম্পন্ন করে কনেকে বরের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া। বর্তমানে এনগেজমেন্টের নামে আংটি পরিয়ে রাখার যে প্রচলন মুসলিম সমাজে চালু হয়ে গেছে তা কখনোই শরীয়ত সমর্থিত নয়। আর আংটি পরানোর দ্বারা পাত্র-পাত্রী ও উভয় পরিবারের মাঝে কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। এনগেজমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর কোন পক্ষ যদি গ্রহণযোগ্য কারণে এই বিবাহে অনিচ্ছুক হয়; বরং অন্যত্র বিবাহ করতে চায় তাতে কোন বাঁধা নেই। সুতরাং বিবাহের নির্ধারিত তারিখ আসার পূর্ব পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ের পরস্পর দেখা-সাক্ষাত, ফোনালাপ ও সর্বপ্রকার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও হারাম। অনেক স্থানে শুধুমাত্র কাবিন করিয়ে রাখা হয়, সে ক্ষেত্রেও আকদের পূর্ব পর্যন্ত একই বিধান। অনেক সময় দেখা যায় ছেলে-মেয়ে এনগেজমেন্ট বা কাবিনের পর স্বামী-স্ত্রীর মত আচরণ করতে থাকে, যা নিতান্তই গর্হিত ও অশ্লীল কাজ।

শরয়ী দৃষ্টিকোন ছাড়াও উক্ত প্রথায় অনেক সামাজিক ফেতনাও হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এনগেজমেন্টের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময়ে ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যকার অবৈধ সম্পর্ক বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। এর পর বিভিন্ন দ্বন্দের কারণে এ সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়, তা আর বিবাহ পর্যন্ত গড়ায় না। পরবর্তীতে অনেক সময় সেই মেয়ের আর বিয়েই হয় না। এ অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এই ফালতু প্রথা। তাই এনগেজমেন্ট ও আকদবিহীন কাবিন প্রথা পরিত্যাগ করতে হবে। উভয় পক্ষ

সম্মত ও সন্তুষ্ট থাকলে একবারেই বিবাহ পড়িয়ে দিয়ে পাত্রীকে পাত্রস্থ করতে হবে। এটাই ইসলামী পদ্ধতি।

মেয়ে তুলে দেয়া বা উঠিয়ে দেয়ার রসম

অনেক সময় দেখা যায়, আকদ সম্পন্ন হয়ে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু মেয়েকে বাপের বাড়ী রেখে দেয়া হয়। এ সময় জামাতা শ্বশুরালয়ে আসতে থাকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জামাতার আসার অনুমতি থাকে না। আর মেয়েরও তার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার অনুমতি থাকে না; বরং মেয়ে উঠিয়ে দেয়ার জন্য একটি দিন ধার্য করা হয়, যা কখনো মাস বা বছর অতিক্রম করে। তারপর নির্ধারিত দিনে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করে মেয়েকে বরের বাড়িতে পাঠানো হয়। শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে এর কোন যৌক্তিকতা ও বৈধতা নেই। নবীযুগে বা সাহাবা যুগে এমন কোন প্রথা ছিল না। নিয়ম হল, আকদ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দেবে।

গায়ে হলুদ

গায়ে হলুদ প্রথা একটি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি। বিজাতীয় অনুকরণ, অনৈসলামিক প্রথা এবং নানা প্রকারের ইসলাম বিরোধী নাজায়েয কর্ম সংবলিত হওয়ার কারণে এটি সম্পূর্ণ হারাম। বর্তমানে মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে এই প্রথা। বিবাহের একদিন বা দুদিন পূর্বে ছেলে ও মেয়ের গয়ে হলুদ দেয়া হয়। এ উপলক্ষে আলাদা মার্কেটিং করা হয় ও বিভিন্ন উপঢৌকন প্রেরণ করা হয়। ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষের নারীরা সেজেগুজে হলুদ শাড়ী পরে বেপর্দাভাবে হলুদ দেয়ার জন্য এক পক্ষ অপর পক্ষের বাড়িতে যায়। হলুদ দেয়ার সময় চলে নানা প্রকারের প্রথা পালন, নাচ-গান ও গীত গাওয়া। মেয়ের সর্বাঙ্গে ছেলে পক্ষের যুবক-যুবতী ও দেবর-ভাসুররা হলুদ মাখিয়ে দেয়। এ সময়ে চলে নানা প্রকারের বেহায়াপনা। ছেলের গায়ে হলুদ মাখায় মেয়ে পক্ষের যুবতী শালী ও অন্যান্য আত্মীয়ারা। এখানেও চলে নাচ-গান ও বিভিন্ন প্রকার বেহায়াপনা। এমনিতেই যেখানে ভিন নারী ও পুরুষের সাথে দেখা দেয়া নাজায়েয সেখানে কিভাবে মেয়ের গায়ে ছেলেরা হলুদ মাখিয়ে গোছল করিয়ে দেয় এবং ছেলের শরীরে মেয়েরা হলুদ মাখিয়ে গোছল করিয়ে দেয়! শরয়ী দৃষ্টিকোন ছাড়াও এটা সভ্যতা, ভদ্রতা ও সুস্থ রুচির পরিপন্থী।

কাবিন বা বিবাহ রেজিস্ট্রি ও জরুরী জ্ঞাতব্য

শরীয়তের দৃষ্টিতে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মোহর ধার্য করে একই মজলিসে ঈজাব-কবুল হলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। কাবিন রেজিস্ট্রির যে সরকারী নিয়ম প্রচলিত আছে এটি একটি উত্তম কাজ এবং প্রমাণ হিসেবে পরবর্তীতে কাজে লাগে। তবে কাবিন রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম ও ভুল হয়ে থাকে যা পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হয়। কাবিন রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, এটি হতে হবে শরয়ী আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর। অনেক সময় দেখা যায়, আকদের পূর্বেই কাবিননামা তৈরী করা হয় এবং সকলের স্বাক্ষর নিয়ে নেয়া হয়। অথবা শুধুমাত্র স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হয়, পরবর্তীতে কাজী নিজ ইচ্ছামত কাবিননামা পূরণ করে। এতে করে কাবিননামার শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে না। সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি হবে তা হল, কাবিন নামার ১৮নং অনুচ্ছেদে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্ধারিত কিছু শর্তে নিজের উপর তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই ক্ষমতা স্ত্রী তখনই প্রপ্ত হবে যখন কাবিননামা আকদ সম্পন্ন হওয়ার পরে করা হবে। যদি আকদের পূর্বে কাবিন করা হয় এবং পরবর্তীতে স্ত্রী নিজের উপর তালাক গ্রহণ করে এবং অন্য কোথাও বিবাহ বসে তাহলে তার তালাক গ্রহণও বিশুদ্ধ হবে না এবং দ্বিতীয় বিবাহও বিশুদ্ধ হবে না। তাই আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর পাত্রসহ উভয় পক্ষ কাবিননামার সবগুলো শর্ত ভালোভাবে পড়ে বুঝে তারপর তাতে স্বাক্ষর করবে। নাদান কাজির উপর ভরসা করে ছেড়ে দেবে না।

মোহর নির্ধারণ

দেনমোহর স্ত্রীর প্রাপ্য একটি অধিকার, যা তাকে তার সম্মানী স্বরূপ প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

واتوا النساء صدوقاتهن نحلة

অর্থ : তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর প্রদান কর। (সূরা নিসা-৪)

এছাড়াও আরো একাধিক আয়াতে স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। স্বামীর পক্ষ হতে ধার্যকৃত এই মোহর ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে একটি ঋণ, যা কখনোই মাফ হয় না। এমনকি স্বামী মোহর আদায় না করে মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মোহর আদায় করতে হয়। তবে যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার হক মাফ করে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।

এখন প্রশ্ন হল, কী পরিমাণ দেনমোহর ধার্য করতে হবে? আমাদের দেশে যে লৌকিকতা বশত পাত্রের সাধ্যাতীত মোহর ধার্য করা হয় তার বৈধতা কতটুকু? এক্ষেত্রে দুটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমটি হল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركة ايسره مونة

অর্থ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই সবচেয়ে বরকতপূর্ণ বিবাহ হল সেটি যার খরচাপাতি কম হয়। (সুনানে বাইহাকী; হা.নং ২৪৫২৯)

হাদীস বিশারদ মোল্লা আলী ক্বারী রহ. খরচাপাতির ব্যাখ্যা করেছেন, বিবাহের সময়ের খরচ ও দেনমোহর।

অপরটি হল হযরত ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قال لاتغالوا صداق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا اوتقوى عند الله كان اولاكم واحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما اصدق امرأة من نساءه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من اثني عشرة اوقية وان الرجل ليثقل صدقة امراته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت اليك علق القربة

অর্থ : হযরত ওমর রাযি. বলেন, তোমরা নারীদের মোহর নির্ধারণে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা অধিক মোহর নির্ধারণ যদি দুনিয়ার সম্মানের বস্তু হত অথবা আল্লাহর নিকট তাকওয়া হিসেবে পরিগণিত হত, তাহলে সে বিষয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের তুলনায় অধিক উপযোগী ও হকদার হতেন। তিনি তো তাঁর কোন স্ত্রীকে বার উকিয়ার অধিক দেনমোহর প্রদান করেন নি, আর না এর অধিক তার কোন কন্যাকে প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে মানুষ তার স্ত্রীর দেনমোহর অধিক পরিমাণে ধার্য করে এবং পরবর্তীতে এটি তার মনে তার স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ হয়। এক পর্যায়ে সে বলে ফেলে যে, আমার তো তোমাকে পানপাত্রের মুখের রশি পর্যন্ত দিয়ে দিতে হবে। (সহীহ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫৩২)

এর দ্বারা প্রমাণিত হল, নবীপত্নী বা নবীকন্যাগণের মোহর সর্বোচ্চ ১২ উকিয়া ছিল। একমাত্র উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রাযি. এর মোহর ছিল

৪০০০ দিরহাম। যা ধার্য এবং পরিশোধ উভয়টি হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী করেছেন।

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ১০ দিরহাম। আর নবীকন্যা হযরত ফাতেমা রাযি. এর মোহর ছিল একটি বর্ম। যার মূল্য ছিল ৪৮০ বা ৫০০ দিরহাম, যাকে মোহরে ফাতেমী বলা হয়।

১ উকিয়া = ৪০ দিরহাম, ১২ উকিয়া = ৪৮০ দিরহাম। ১ দিরহাম = ৩.০৬১৮ গ্রাম রূপা (১ দিরহাম = ২.৯৭৫ গ্রাম রূপার একটি মতও রয়েছে)। ৪৮০ দিরহাম = ১৪৬৯.৬৬৪ গ্রাম রূপা। ১০ দিরহাম = ৩০.৬১৮ গ্রাম রূপা । ৫০০ দিরহাম = ১৫৩০.৯ গ্রাম রূপা। ১ ভরি = ১১.৬৬৪ গ্রাম। আমাদের দেশী টাকা হিসেবে উপরোক্ত হিসাব বের করতে চলমান বাজারে প্রতি গ্রাম রূপার দাম জেনে হিসাব বের করবে। (ভরি হিসেবে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ২.৫ ভরি রূপা বা তার মূল্য, মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ ১৩১.২৫ ভরি অপর বর্ণনা মতে ১৫০ ভরি রূপা বা তার মূল্য।)

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হল যে, মোহর ধার্য করার ক্ষেত্রে পাত্রের সাধ্যাতীত বা লোকদেখানো মোহর ধার্য করা যাবে না; বরং পাত্রীর সম্মান ও বংশ মর্যাদা এবং পাত্রের সামর্থ্য উভয়ের বিবেচনায় মোহর ধার্য করতে হবে, যা অবশ্যই পরিশোধের নিয়ত থাকতে হবে। আর মোহরে ফাতেমী অবস্থাভেদে মধ্যবিত্তদের জন্য উত্তম, একচেটিয়া সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। যে ব্যক্তি অধিক মোহর ধার্য করে তা আদায় করে না বা স্ত্রীর নিকট থেকে মাফ চেয়ে নেয় সে নিকৃষ্টতম কাপুরুষ এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে নিন্দনীয় ব্যক্তি।

মেয়ের ইযন বা সম্মতি গ্রহণ

বিবাহের পূর্বে মেয়ের কাছ থেকে সম্মতি গ্রহণ বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যক। অন্যথায় বিবাহই হবে না। তাই আনুষ্ঠানিক বিবাহের পূর্বে মেয়ের বাবা অথবা মাহরাম কোন আত্মীয় মেয়ের নিকট গিয়ে ছেলের বর্ণনা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে উক্ত ছেলের সাথে তাকে বিবাহ দেয়ার জন্য তার নিকট সম্মতি বা অনুমতি চাইবে। মেয়ে যদি পূর্ব স্বামী পরিত্যক্তা হয় তাহলে মৌখিকভাবে রাজি আছি বা সম্মত আছি বা অনুমতি দিলাম- এ জাতীয় শব্দ বলে সম্মতি প্রদান করবে। আর মেয়ে কুমারী হলে এবং বাবা-দাদা কর্তৃক সম্মতি চাওয়ার পর সে মৌখিক সম্মতি দিলে ভাল, অন্যথায় তার মৌনতাকেই সম্মতি ধরা হবে। ইযন গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়ের কাছ থেকে কবুল বলানোর কোন নিয়ম নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কুমারী লাজুক মেয়ের কাছ থেকে মৌখিক সম্মতি আদায়ের জন্য অনর্থক সময় ব্যয় বা চাপ প্রয়োগ করা হয়, এটিও নিষ্প্রয়োজন।

উকীল বাপ ও ইযন গ্রহণের সময় সাক্ষী

মেয়ের নিকট থেকে যে বিবাহের অনুমতি আনতে যায় সে-ই মূলত মেয়ের উকিল। আর পূর্বেই বলা হয়েছে উকীল হিসেবে ইযন আনতে মেয়ের বাবা নিজে বা তার কোন মাহরাম আত্মীয় যাবে। অনেক স্থানে দেখা যায়, মেয়ের গায়রে মাহরাম কোন পুরুষকে উকীল বানানো হয় এবং পরবর্তীতে সে ব্যক্তি মেয়ের উকিল বাপ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তার সাথে আর মেয়ে পর্দা করে না। এটি নিতান্তই মূর্খতা। প্রথমত সম্মতি আনতে গায়রে মাহরাম কারো যাওয়া জায়েয নেই, আর এমন কেউ সম্মতি এনে বিয়ে পড়িয়ে দিলেও পরবর্তীতে সে ব্যক্তি মেয়েটির বাবা হয়ে যায় না এবং পূর্বের ন্যায় তার সাথে পর্দার বিধান বলবৎ থাকে। আবার অনেক স্থানে দেখা যায় মেয়ের ইযন আনতে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের দু দুজন সাক্ষী মেয়ের নিকট যায়। এখানেও সাক্ষীর বাহানায় মেয়ের নিকট গায়রে মাহরামের যাওয়া বৈধ নয়। তাছাড়া ইযন গ্রহণের সময় সাক্ষী রাখা নিষ্প্রয়োজন।

মেয়ের অমতে বা জোরপূর্বক বিবাহ প্রদান

ইসলামে নারীকে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দেয়া হয়েছে এবং তার মতকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাই যদি কোন অভিভাবক মেয়েকে জোরপূর্বক তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ প্রদান করে তাহলে সে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। আর জোর করে মৌখিক স্বীকৃতি আদায় করে বিয়ে করিয়ে দিলে এটি হবে মেয়ের প্রতি অত্যাচার ও অনধিকার চর্চা। মেয়েরও পাত্রকে পছন্দ করার অধিকার আছে। শুধু বাবা-মায়ের পছন্দ হলেই যে মেয়েটিকে তার অপছন্দের পাত্রকে বিবাহ করতে হবে, এ মানসিকতা নিতান্তই নিষ্ঠুরতা। আজীবন সংসার মেয়ে করবে, মেয়ের বাবা-মা নয়। তাই যদি তার মতকে অগ্রাহ্য করা হয় তাহলে হয়তো তার সংসারই ভেঙে যাবে অথবা সে তা মেনে নিতে পারবে না। ফলে আজীবন সে অশান্তিতে ভোগবে আর কল্যাণময়ী বাবা-মাকে আমৃত্যু ভৎর্সনা করবে।

ইসলাম মেয়েকে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে এর অর্থ এটা নয় যে, সে নির্লজ্জভাবে যে কোন ছেলেকে পছন্দ করে তার সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য বাবা-মাকে চাপ প্রয়োগ করবে, অথবা পরিবারের অসম্মতিতে নিজেই অপাত্রে বিবাহ বসবে! এমনটা করলে ক্ষেত্র বিশেষে শরীয়ত অভিভাবককে সে বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটানোরও অধিকার দিয়েছে। তাকে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার প্রদানের অর্থ হল, পারিবারিকভাবে তার জন্য যে পাত্র দেখা হয় তার বিষয়ে সে আপন পছন্দ-অপছন্দের মত প্রকাশ করতে পারবে এবং সেই পাত্রের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করার অধিকার সে পাবে যাকে তারও পছন্দ হয়। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ে ও অভিভাবক কেউই এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না; বরং উভয়ের পছন্দ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা এ শুভ কাজে অগ্রসর হবে এটাই শরীয়তের দাবী।

আকদে নিকাহ

পরিবারের সম্মতিক্রমে পাত্রের সাধ্যভুক্ত দেনমোহর ধার্য করে পাত্রীর ইযন বা অনুমতিক্রমে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঈজাব ও কবুল অনুষ্ঠিত হওয়া। বিবাহের পূর্বে খুৎবা পাঠ সুন্নত। দীনদার ব্যক্তির মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো কাম্য। আক্‌দের পর পাত্র-পাত্রীকে মোবারকবাদ ও দোয়া দিয়ে بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير বলা উপস্থিত সুন্নত।

ওলীমা বা বৌ-ভাত

বিবাহের সময় অন্য মজলিসে কিছু খেজুর ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা ছাড়া কোন অনুষ্ঠান বা আপ্যায়নের আবশ্যকতা শরীয়তে নেই। এ ক্ষেত্রে অন্য যত আয়োজন ও অনুষ্ঠান এবং সামাজিক প্রথা পালিত হয়ে থাকে সব কিছুই শরিয়ত বহির্ভূত এবং পরিতাজ্য। শরীয়তে শুধুমাত্র বাসর যাপনের পরবর্তী দিবসে সুন্নত হিসেবে পাত্রকে ওলীমার আয়োজন করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, ফরয বা ওয়াজিব হিসেবে নয়। আর এটিও পাত্রপক্ষের সাধ্য অনুযায়ী হতে হবে, কোন রকম লৌকিকতা ও অপচয় ছাড়া।

ওলীমা অর্থ বড় কোন ভোজসভা অথবা ভারী কোন খাবার নয়। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বিবাহের ওলীমায় মাত্র দুই সের যব দিয়ে আপ্যায়ন করান হয়েছে। (সহীহ

বুখারী; হা.নং ৫১৭২) উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা রাযি. এর সাথে নবীজীর বিবাহ সফররত অবস্থায় হয়েছিল। সেখানে নবীজী দস্তরখান বিছিয়ে ওলীমা হিসেবে কিছু খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করেছিলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৬৯) উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব রাযি. এর ওলীমায় রুটি ও বকরীর গোশত দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়েছিল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৭১)

বর্তমানে ওলীমার নামে যে সাধ্যাতীত ও ব্যয়বহুল আয়োজন করা হয় তা শরীয়তের সুন্নত ওলীমার সাথে বিলকুল সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া বৌভাত বা ওলীমার নামে কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করা এবং সেখানে নারী-পুরুষের পর্দাহীন মেলামেশা, গান-বাদ্য ও অনুষ্ঠানের ভিডিও চিত্র ধারণ এবং ক্যমেরা ও মোবাইলে ছবি ওঠানোর মত যে শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে তা বিবাহের বরকতকে বিনষ্ট করে আজীবন খোদায়ী গজবে পতিত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। তাই মুসলমানের ওলীমা ঘরোয়া পরিবেশে সীমিত পরিসরে হওয়া চাই।

বরযাত্রা ও কনের বাড়িতে অনুষ্ঠান

ইসলামী বিবাহে কনের বাড়িতে অধিক লোকের সমাগম বা বিশাল আয়োজন এবং লৌকিকতাপূর্ণ ভোজনের কোন অনুমতি নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদরের দুলালী ফাতেমাকে হযরত আলী রাযি. এর সাথে বিবাহ পড়িয়ে নিজে কন্যাকে তার ঘরে দিয়ে এসেছেন। এমনই ছিল নবী ও সাহাবাযুগের বিবাহ। কনে আনার জন্য কোন বরযাত্রা হত না বা কনের বাড়ীতে কোন ভোজসভা হত না; বরং কনের বাবা বা অভিভাবক কনেকে নিজে বরের বাড়িতে দিয়ে আসতো। তাহলে এখন চলন বা বরযাত্রার নামে গাড়িবহর নিয়ে কনের বাড়ীতে শত শত লোকের যে অযাচিত বোঝা চাপানো হয় তা কীভাবে শরীয়ত সম্মত হতে পারে?

ফাতাওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে যদি মেয়ে পক্ষের বিবাহোত্তর আয়োজন ও আপ্যায়ন কোন রকম সামাজিক চাপ বা ছেলে পক্ষের আব্দার রক্ষার্থে না হয় এবং যশখ্যাতি ও অহঙ্কার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে না হয় এবং লৌকিকতা, অপচয় ও শরীয়ত বহির্ভূত কোন কাজ না হয় তাহলে ঘরোয়া পরিবেশে তা জায়েয। উল্লিখিত কোন শর্ত পরিত্যক্ত হলে সে অনুষ্ঠান করা বা তাতে অংশগ্রহণ করা নাজায়েয।

কিন্তু বর্তমানে ওলীমার তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় মেয়ের বাড়ির অনুষ্ঠানকে। খোলা মাঠে বিশাল শামিয়ানা, বিলাসবহুল গেট, মরিচবাতির আলোকসজ্জা, বাড়ীর ছাদে ব্যান্ড পার্টি ভাড়া করে সারা রাতের গান-বাদ্যের আসর, সে আসরে মদপান করে বুড়ো-গুড়োর উদ্দাম নৃত্য ইত্যাদি হারাম ও অপচয়মিশ্রিত আয়োজন না হলে যেন বিয়েই হয় না, যেন মেয়েকে যথাযোগ্য সম্মানে তুলে দেয়াই হয় না! তাই বর্তমান সময়ে বৈধতার কোন কৌশল অন্বেষণ না করে একজন মুসলমানের জন্য এ ধরণের অনৈসলামিক কাজ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। মেয়ের বাড়ীর অনুষ্ঠানের প্রথা বন্ধে এবং মেয়ের বাবার অপচয় রোধে ছেলেপক্ষের লোকেরা পরামর্শপূর্বক দায়িত্বপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সহজেই এই প্রথা বন্ধ করা সম্ভব।

বিবাহ অনুষ্ঠানে তোহফা প্রদান

হাদিয়া বা তোহফার ভিত্তি কেবল পরস্পর সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পর হাদিয়ার আদান-প্রদান করো, এতে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু কোন রকম কৌশলে বা চাপ সৃষ্টি করে কারো কাছ থেকে কিছু আদায় করলে তা হাদিয়া হয় না। তাকে হয় ঘুষ না হয় ছিনতাই বলা যেতে পারে। ঠিক তদ্রুপ কেউ যদি কাউকে কোন কিছু দিতে বাধ্য হয় তাহলে সেটাও হাদিয়া নয়; বরং ভদ্র ছিনতাই।

এবার আসা যাক আমাদের দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে অতিথি কর্তৃক প্রদত্ত গিফট বা উপঢৌকনের বিষয়ে। এ ক্ষেত্রে বাস্তবে যা পরিলক্ষিত হয় তা হল, বিবাহ অনুষ্ঠানে গিফট গ্রহণের জন্য দরজার মুখে আলাদা টেবিল বসানো থাকে এবং একজন খাতা নিয়ে বসে নাম লিখে লিখে গিফট গ্রহণ করে। কে কী দিল বা কত টাকা দিল তার নামসহ খাতায় ওঠানো হয় এবং পরে এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও হিসাব-নিকাশ করা হয়। অনেকে তো অনুষ্ঠানের খরচ ও প্রাপ্তির মাঝে তুলনা করে লাভ-লোকসানের হিসাব কষে। অনেকে আবার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে পূর্ব হুশিয়ারী দিয়ে আসে যে, এটা তার একমাত্র মেয়ের বা ছেলের অথবা সর্বশেষ সন্তানের বিবাহ, তাই তারা যেন তেমন প্রস্তুতি নিয়ে আসে। সুতরাং এমন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হাদিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে হয়, না কি বিরক্তি ও চাপে পড়ে হয় তা সকলেরই জানা। আমন্ত্রিত অনেকে তো উপঢৌকন দেয়ার ভয়ে অনুষ্ঠানেই যায় না এবং পরে বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে ওজর পেশ করে। অতএব এ ধরণের গিফট, উপঢৌকন বা হাদিয়াকে ভদ্র ছিনতাই ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? তাই এগুলো গ্রহণ করলেও শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে তা ব্যবহার বৈধ হবে না।

মরণ ব্যাধি যৌতুক

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের ২০০৩ সালের সংশোধিত আইনে যৌতুকের সজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে- কোন বিবাহে বর বা বরের পিতামাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত বরপক্ষের কোন ব্যক্তি, অথবা কনে বা কনের পিতামাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত কনেপক্ষের কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তার পূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে বিবাহ স্থির থাকার শর্তে বিবাহের পণ হিসেবে অন্য পক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত বা দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ।

এক কথায় বরপক্ষ বা কনেপক্ষের কেউ বৈবাহিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অপর পক্ষের নিকট হতে কিছু দাবী করা, আদায় করা বা গ্রহণ করাকে যৌতুক বলে। তবে দেনমোহর যৌতুকের মধ্যে গণ্য নয়।

আমাদের সমাজে কনেপক্ষের লোকজন থেকে বরপক্ষের নিকট সাধারণত কোন দাবী বা চাহিদা করা হয় না। এটি একসময় হিন্দু সমাজে কন্যাপণ নামে প্রচলিত ছিল। এখন যৌতুক বলতে বোঝায় বরপক্ষের দাবী বা গৃহীত অর্থ-সম্পদকে।

বিবাহ পরবর্তী সময়ে মেয়ের বাবা যদি স্বেচ্ছায় কোন রকম মানসিক চাপ ছাড়া মেয়ে বা জামাতাকে কোন কিছু প্রদান করে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সাধারণ হাদিয়া বিবেচনায় তার বৈধতা রয়েছে। কিন্তু মেয়ে পক্ষের নিকট ছেলে পক্ষের যদি নির্ধারিত বা অনির্ধারিত কোন দাবী বা আশা থাকে কিংবা মেয়ের বাবা যদি সামাজিক সম্মান রক্ষার্থে অথবা সাধ্যাতীত কোন কিছু প্রদান করে তাহলে তা যৌতুক বলে বিবেচিত হবে। অনেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক **(১৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**

আল-কাউসার প্রকাশনীর প্রকাশিত কিছু বই

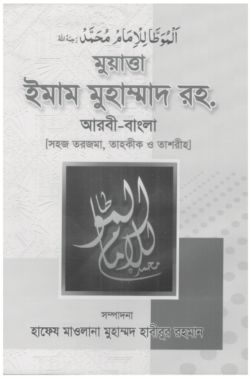

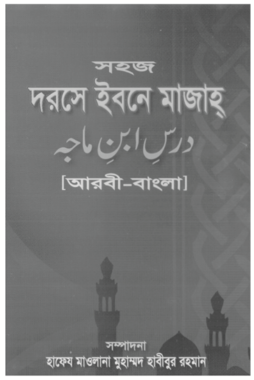

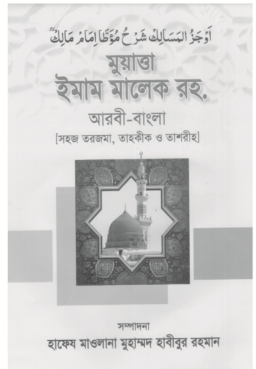

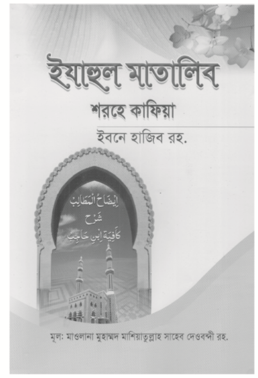

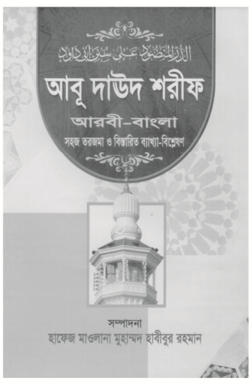

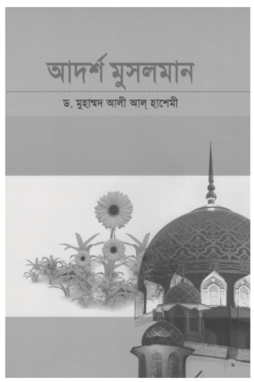

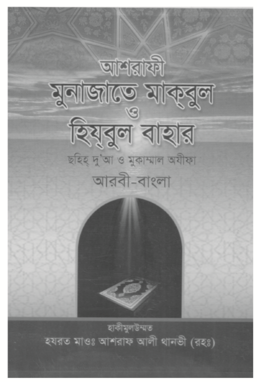

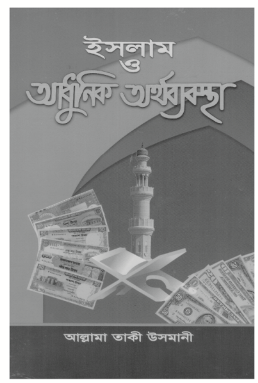

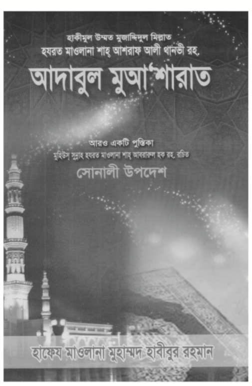

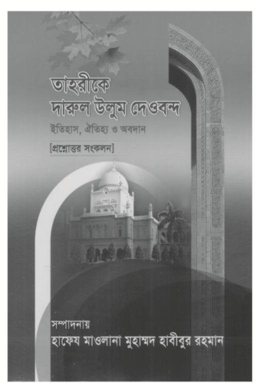

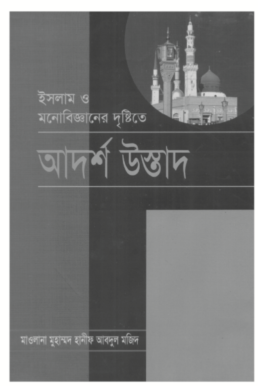

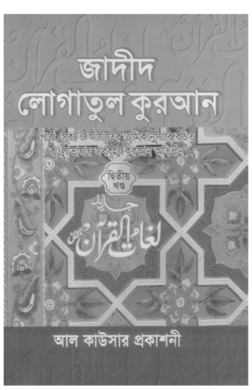

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

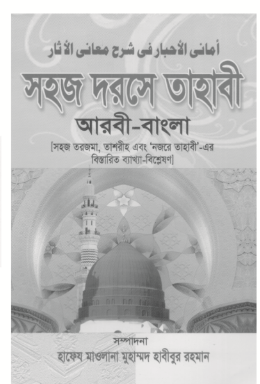

নারীর কর্ম ও কর্মসংস্থানঃ কিছু প্রস্তাবনা

মাওলানা জালীস মাহমূদ

দুনিয়ামুখী শিক্ষার প্রভাব আর আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে (?) দেশের বর্তমান প্রজন্ম ভোগবাদী মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের উন্নতিকেই তারা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করছে। পরকালের চিন্তা-ভাবনা, পরকালীন উন্নতি-অবনতি তাদের কাছে গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থিব জীবনের উন্নতিকে কেন্দ্র করেই তাদের দৌড়ঝাঁপ আবর্তিত হচ্ছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা যেন এ ক্ষেত্রে আরো বেশি অগ্রসর। অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত খরচে তারা সন্তুষ্ট হতে পারছে না। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে তারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মের ময়দানে নেমে পড়ছে।

ভোগবাদী মানসিকতা আর আকাশ সংস্কৃতির কুপ্রভাবে আমাদের মেয়েরা পাশ্চাত্যের নারীদেরকে নিজেদের অনুকরণীয় মনে করে ব্যাপকহারে প্রয়োজন বা ঠেকা ছাড়াই চাকুরী করার প্রতি ঝুঁকছে। চাকুরী-বাকুরি করে তারা নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখছে। আমাদের নারীমহল ভাবছে, চাকুরী-বাকুরী করে পাশ্চত্যের নারীরা খুব সুখে শান্তিতে আছে। সেই অদেখা সুখের আশায় আমাদের মেয়েরাও কর্মের ময়দানে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এরা স্থুল দৃষ্টিতে শুধু ওদের বাহ্যিক লম্ফ-ঝম্ফই দেখে; অর্ন্তভেদী দৃষ্টি দিয়ে ওদের অশান্তি আর অন্তর্জ্বালা দেখতে পায় না। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিলে এদের কাছে ওদের অস্বস্তি আর অশান্তি স্পষ্ট হয়ে উঠতো। পাশ্চাত্যের নারীরা কর্মকে জীবনসঙ্গী করে সংসার, সন্তান ও পরিবার থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। মানুষ সামাজিক ও পারিবারিক জীব হওয়ায় পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কখনোই সে শান্তি পেতে পারে না। আর হচ্ছেও তাই। শান্তির মৌলিক বিষয় যদি আত্মিক প্রশান্তি হয়ে থাকে তাহলে ওরা মোটেও শান্তিতে নেই। ওদের আছে শুধু অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক জৌলুস।

একটা সময় ছিল যখন পাশ্চাত্যের নারীরাও আদর্শ চাকুরে হাওয়ার চেয়ে আদর্শ গৃহিনী হওয়ার মধ্যেই নারিত্বের মর্যাদা খুঁজে পেত। তারাও খাটি মুসলিম নারীদের মত গৃহে অবস্থানের মধ্যেই প্রশান্তি লাভ করত। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে যখন পাশ্চাত্যে (ইংল্যান্ডে) শিল্পবিপ্লব ঘটল। তখন তাদের জীবন বৈচিত্রের মাঝেও বিপ্লব ঘটে গেল। কিছু নারীলোভী কামুক প্রকৃতির পুরুষ নারী স্বাধীনতার নামে, নারীর সমধিকার প্রতিষ্ঠার মোড়কে নারীদেরকে যথেচ্ছা ভোগ করার মানসে রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার করে নারীদেরকে পুরুষের সাথে কর্মের ময়দানে নামিয়ে দিল। অবলা নারীরা পুরুষদের কূটচাল ধরতে পারল না। তারা সেই কামুক শ্রেণীর পুরুষদের দেখানো পথে অগ্রসর হয়ে জীবনের শান্তি বির্সজন দিল। আর্থিক উন্নতি তাদের কিছুটা হয়েছে বটে; কিন্তু তারা যে সুখের আশায় কর্মের ময়দানে নেমে পড়েছিল তার ছিটেফোঁটাও তারা পায়নি। সর্বস্তরে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে কয়েক যুগের মধ্যেই রাষ্ট্র তাদের কাছ থেকে লাখ লাখ জারজ সন্তান উপহার পেল। পরকীয়া আর বিবাহ বিচ্ছেদ 'ডালভাত' হয়ে গেল। এতদিনে এখন তারা হাঁপিয়ে উঠেছে। তারা এখন প্রচলিত জীবনধারা পরিবর্তন করতে চাচ্ছে। হাজারো অপপ্রচার আর মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও ইসলামের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে পাশ্চাত্যের শত শত খ্রিস্টান নারী প্রতিদিন ইসলাম গ্রহণ করছে, ইসলামের অনুশাসন গ্রহণ করে জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে। প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও জীবনে সুখের ছোঁয়া পেতেই তারা ইসলাম অনুসরণের যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের নারী ও নারী অভিভাবকেরা ওদের উগরে দেয়া খাদ্য কুড়িয়ে নিচ্ছে। প্রবাদ আছে 'সুখে থাকলে ভুতে কিলায়'। আমাদের নারীদের মাথায় পশ্চিমাদের ভূত চেপে বসেছে। ওরা যা যেভাবে করে দেখাচ্ছে আমাদের মেয়েরা তা সেভাবে করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের সমাজ-সংসারে বড় অবক্ষয় নেমে আসবে যেমন অবক্ষয় নেমে এসেছে পাশ্চত্যের সমাজ-সংসারে।

নারীস্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য 'কানাডা'র কর্মজীবী নারীদের সম্পর্কে কানাডীয় একটি সংস্থা কানাডার ১৫শ কর্মজীবী নারীর উপর জরিপ চালিয়ে এই ফলাফল প্রকাশ করেছে যে, সেখানকার ৪৮ শতাংশ নারী কর্মস্থলে বিভিন্ন ধরণের যৌন নীপিড়নের শিকার হয়। কিন্তু চাকুরী হারানোর ভয়ে কিংবা মান খোয়া যাওয়ার ভয়সহ নানাবিধ কারণে তারা এই ন্যাক্কারজনক বিষয়টি চেপে যেতে বাধ্য হয়। (রেডিও তেহরান ৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ইং)

কানাডার অবস্থার সাথে পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের নারীদের অবস্থা তুলনা করলেই পাশ্চাত্যের নারীদের সুখচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ পরিস্থিতিতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুমিন-মুসলিম নারীদের জন্য গৃহের বাইরে কর্মের বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে সবিস্তার আলোচনা হওয়া সময়ের দাবী।

ইসলাম নারী জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন অভিভাবকের উপর তার জীবনের যাবতীয় খরচের দায়িত্ব ওয়াজিব করে দিয়েছে। জন্মের পর থেকে বিবাহ পর্যন্ত তার খরচের দায়িত্ব পিতার উপর, পিতার অবর্তমানে ভাইয়ের উপর, তাদের অবর্তমানে বংশের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়ের উপর নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব। বিবাহের পর তার যাবতীয় খরচের দায়িত্ব স্বামীর উপর, স্বামী বিয়োগের পর এ দায়িত্ব সন্তানদের উপর। কোনো নারীর যদি খরচ বহনের যোগ্য কোনো অভিভাবক না থাকে তাহলে তার ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বহন করা হবে। নারীর যাবতীয় বৈধ প্রয়োজন মেটাতে যেহেতু তার অভিভাবক বাধ্য, তাই ইসলাম শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া নারীকে গৃহের বাইরে পুরুষের কর্মময়দানে যোগদানের অনুমতি দেয় না।

যে নারীর ভরণ-পোষণের জন্য সক্ষম অভিভাবক রয়েছে (যেমন, বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে) তার জন্য ঘরের বাইরে পুরুষমহলে কোনো কাজে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নেই। জায়েয না হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণও রয়েছে। যথা:

ক. নারীর সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের মাধ্যমে নারীকে নিজ গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন।'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে মূর্খযুগের অনুরূপ নিজেকে প্রদর্শন করবে না...। (সূরা আহযাব- ৩৩)

এই আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হল, প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের গৃহের বাইরে যাওয়া বৈধ নয়। আর প্রয়োজনে যেতে হলে নিজেকে প্রদর্শন না করে পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষা করে যেতে হবে। প্রয়োজন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানব জীবনের চারটি মৌলিক প্রয়োজন যথা: অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থান।

খ. আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষ উভয়কে পরপুরুষ ও পরনারী থেকে দৃষ্টি সংযত করতে বলেছেন এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থান হেফাযত করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'ঈমানদার পুরুষদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হিফাযত করে... এবং ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে আনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হিফাযত করে...' (সূরা নূর- ৩০, ৩১)

নারীরা যখন দিনের সিংহভাগ সময় পরপুরুষবেষ্টিত কর্মস্থলে অবস্থান করবে তখন তাদের জন্য পরপুরুষ থেকে দৃষ্টি সংযত করা সম্ভব হবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখার লোভ সামলাতে পারবে না। চোখাচোখি ও দেখাদেখির মাধ্যমে হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টি হয়ে এই সম্পর্ক লজ্জাকর পর্যায়ে গড়ানো খুবই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে লজ্জাস্থান হিফাযতের উক্ত আদেশ মানাও সম্ভপর হবে না।

গ. সূরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করবে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।'

এ আয়াতে যদিও সরাসরি নবীপত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু এই বিধান সর্বস্তরের মুমিন নারীদের জন্য প্রযোজ্য; এতে কোনো আলেমের দ্বিমত নেই। যেসব নারীরা অফিস-আদালতে চাকুরী করতে যায় তারা পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠ ও আকর্ষণীয় ভঙ্গি ছাড়া কথা বলতে পারে না। এটা সম্ভবও নয়। কেননা যাদের সাথে সারাটা দিন অবস্থান করতে হয়, যে তার বস কিংবা কলিগ তার সাথে কোমল কণ্ঠে কথা না বলে উপায় নেই। বসের সাথে রূঢ়, নিরস ভঙ্গিতে কথা বললে সে হয়তো তার চাকুরীটাই 'নট' করে দিতে পারে, আর কলিগ হয়তো তার দোষ খোঁজায় লেগে যেতে পারে। এসব বিবেচনায় একজন নারী কর্মস্থলে তার পুরুষ বস ও কলিগের সাথে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি রসিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে থাকে। আর অনেক মেয়েকে তো শুধু পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠ ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলার জন্যই চাকুরী প্রদান করা হয়। যেমন: সেলসগার্ল ও রিসেপশনিস্ট মেয়েরা। এমতাবস্থায় পুরুষ মহলে মেয়েদের চাকুরী কীভাবে বৈধ হতে পারে?

ঘ. শরীয়তে নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ স্বীকৃত নয়। বোরকাবৃত হয়েও পরপুরুষদের সাথে একাকী অবস্থান করা, হাসি-ঠাট্টা করা জায়েয নেই। হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে, 'মাহরাম পুরুষ ব্যতীত কোনো মহিলা যেন পরপুরুষের সাথে একাকী অবস্থান না করে...।' (সহীহ বুখারী হা.নং ৫২৩৩)

ঙ. সর্বাবস্থায় যথার্থ পর্দা রক্ষা করা নারী পুরুষ উভয়ের উপর ফরয। কিন্তু বর্তমানে কর্মজীবী নারীরা যাতায়াতের পথে ও কর্মস্থলে অবস্থানের সময় পর্দা রক্ষা করে না। কেউ করার চেষ্টা করলেও যথাযথভাবে করতে পারে না। আর এই পর্দা রক্ষা না করায় এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে সমাজে যিনা-ব্যাভিচার, পরকীয়া ও বিবাহ বিচ্ছেদের হার পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে গেছে। পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করলে এসব ব্যাধি ছড়িয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা একজন নারী যখন অফিসে যায় তখন সে বধূ সেজে ঘর থেকে বের হয়। সারাটা দিন বধূবেশে পরপুরুষবেষ্টিত কর্মস্থলে অবস্থান করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কর্মের ক্লান্তি দূর করার জন্য রসালো আড্ডা চলতে থাকে। পৌরুষদীপ্ত একজন পুরুষ এমন বধূর সাজে সজ্জিত নারীকে দীর্ঘ সময় কাছে পেলে তার অন্তরে কুবাসনা তৈরি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর নারীর সহকর্মী পুরুষটি কিংবা তার বস যে কি না অফিসের সময়টা বরের মত পরিপাটি হয়ে থাকে, নারীর মনও তার প্রতি খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আগুনের সংস্পর্শে মোম যেমন গলতে থাকে, তেমনি নারী-পুরুষও একে অন্যের সংস্পর্শে বিগলিত হতে থাকে। এটা প্রকৃতির বাস্তবতা; এ বাস্তবতা কারো অস্বীকার করার জো নেই। এভাবে ঐ বিবাহিত পুরুষ যে তার স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে সব সময় অগোছালো ও অপরিপাটি দেখতে দেখতে 'বোর' হয়ে গেছে সে অফিসের সুদর্শনা সুসজ্জিতা কলিগকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এই স্বপ্ন কখনো বিছানায় আবার কখনো বিবাহ বিচ্ছেদে গড়ায়।

চ. নারী-পুরুষ উভয়কে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন আকার আকৃতি ও ভিন্ন প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নারীর আকার-আকৃতি ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ তা'আলা নারীকে সংসাররক্ষা ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়েছেন। নারী তার সংসারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...। নারী স্বামীর সংসার এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীল সে তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...।' (সহীহ বুখারী হা.নং ৭১৩৮) এই হাদীসে নারীর কর্ম ও কর্মস্থলের পরিষ্কার বর্ণনা পাওয়া গেল। বাস্তব ঠেকা ছাড়া নারীর জন্য শরীয়ত নির্ধারিত এই কর্মস্থল ত্যাগ করা এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা হয় এমন কোনো কর্ম গ্রহণ করা জায়েয নয়।

তবে ইসলাম স্বভাব ধর্ম। ইসলাম কারো প্রয়োজন ও ঠেকাকে অস্বীকার করে না। যদি কোনো নারীর ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত সক্ষম অভিভাবক না থাকে তাহলে ইসলাম কিছু শর্তসাপেক্ষে নারীকে গৃহের বাইরে গিয়ে কাজ-কর্ম করার অনুমতি দেয়। যথা:

১. খরচ বহনের উপযুক্ত অভিভাবক না থাকা। থাকলেও অভিভাবক তার জীবনের স্বাভাবিক খরচ বহনে অক্ষম হওয়া। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৭৯৫, আল বাহরুর রায়েক ৪/৩৩৩, রদ্দুল মুহতার ৫/২৫৯)

২. যে কাজ করা হচ্ছে সেটা বৈধ হওয়া। অবৈধ কোনো কাজ না করা। কারণ যে কেউ যে কোনো কাজ করবে সেটা বৈধ হওয়া জরুরী। অন্যথায় তার জীবিকাই হালাল হবে না। (সূরা বাকারা- ১৬৮)

৩. স্বামী থাকলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে আর স্বামীর অবর্তমানে অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে কর্মে যোগ দান করা। (সূরা তাহরীম- ৬)

৪. স্বামী বা সন্তানদের হক আদায়ে অবহেলা না করা। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সেবা করা এবং মা হিসেবে সন্তানদের যত্ন করার মধ্যেই নারীত্বের পূর্ণতা নিহিত। এটাই নারীর মূল দায়িত্ব। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে তাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহ হাজারো 'চাকুরে মা'র তুলনায় একজন আদর্শ মায়ের প্রয়োজন অনেক বেশি অনুভব করে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১৩৮)

৫. কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের সময় পরিপূর্ণভাবে পর্দা রক্ষা করা। আঁটসাঁট পোশাক বা আঁটসাঁট বোরকা পরিধান না করা। নিজের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এমন জাঁকজমকপূর্ণ বোরকা পরিধান না করা। ঢিলেঢালা এমন পোশাক পরিধান করা যা দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর বিশেষ করে চেহারা আবৃত থাকে। চেহারা খোলা রেখে বাকি শরীর আবৃত করলে এর দ্বারা পরপুরুষ থেকে পর্দা করার উদ্দেশ্যই হাসিল হয় না। (সূরা আহযাব- ৫৯)

৬. কর্মক্ষেত্র সফর পরিমাণ দূরত্বে অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে বেশি দূরত্বে অবস্থিত না হওয়া। হাদীসে পাকে মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাকে একাকী সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি মাহরাম ছাড়া ফরয হজ্জ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের দেশের যেসব নারীরা মাহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী বিদেশে কাজ-কর্ম করতে যায় এবং মাহরাম ছাড়া সেখানে একাকী অবস্থান করে, তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, তারা কত বড় গর্হিত কাজ করছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১০৩৬)

৭. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কোনো ধরনের সুগন্ধি (আতর, সেন্ট, বডি স্প্রে ইত্যাদি) ব্যবহার না করা। কারণ সুগন্ধি ব্যবহার করলে পরপুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এর কারণে কোনো বিপদও ঘটতে পারে। অতএব নারী নিজের হেফাযতের স্বার্থেই ঘরের বাইরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। তবে ঘরের ভেতর মহিলারা নিজের প্রয়োজনে এবং স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য যে কোনো পবিত্র সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৪৪, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৪১৭১, হাশিয়াতুত দুসূকী ১/৩৯৮, আল মুগনী ইবনে কুদামা ২/৩৭৬,)

৮. কর্মক্ষেত্র পুরুষবেষ্টিত না হওয়া। কর্মক্ষেত্রে কোনো অবস্থায়ই পরপুরুষের সাথে একাকী অবস্থান না করা এবং মাহরাম ছাড়া একাকী পরপুরুষদের সাথে সফরে (অফিস ট্যুরে) না যাওয়া। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৩৩)

গার্মেন্ট বা তৈরি পোশাকশিল্প বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এ শিল্পের প্রায় ৩০% থেকে ৪০% কর্মীই হল নারী। এই হাজার হাজার নারী শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই যে পেটের তাড়নায় এই পেশায় যেতে বাধ্য হয় তা কিন্তু নয়। বরং অনেকেই কিছু অতিরিক্ত আয়ের আশায় কিংবা শখের বশে উক্ত কর্ম গ্রহণ করে। শখের বশে বা অতিরিক্ত আয়ের আশায় উক্ত কর্মে যোগদান বৈধ নয়। তবে যারা বাস্তবিক অভাবের কারণে উক্ত কর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তারা যদি উপর্যুক্ত শর্তগুলো বজায় রেখে কর্মস্থলে অবস্থান করে এবং তাদের কর্মক্ষেত্র পুরুষদের কর্মক্ষেত্র থেকে ভিন্ন হয় তাহলে তাদের উক্ত পেশা গ্রহণ বৈধ হবে।

আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উল্লিখিত শর্তসমূহ যথাস্থানে ঠিক রেখে মহিলাদের জন্য গৃহের বাইরে কাজ-কর্ম করা প্রায় অসম্ভব। আর যাচাই করলে দেখা যাবে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ কর্মজীবী মহিলা এজন্য কাজ করছে না যে, তার জীবনের শরীয়তস্বীকৃত স্বাভাবিক প্রয়োজন তার অভিভাবক কর্তৃক পূর্ণ হচ্ছে না। বরং সিংহভাগ নারী 'নিজ পায়ে' দাঁড়ানোর প্রত্যয় ও আশা নিয়েই সাধারণত কর্মের ময়দানে যোগ দিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আর নিজ পায়ে দাঁড়ানো হয়ে ওঠে না। তাদের উপার্জিত অর্থের সিংহভাগই প্রতিনিয়ত সাজ-সজ্জার নতুন-নতুন সরঞ্জাম ও পরপুরুষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে উপস্থাপনের জন্য নিত্যনতুন ডিজাইন ও স্টাইলের পোশাক ক্রয় করতেই ব্যয় হয়ে যায়। তার উপার্জিত অর্থ দ্বারা সংসারের উল্লেখযোগ্য কোনো উপকারই হয় না। বরং ঘরের রাণী যখন অন্যের চাকরানী হয়ে যায় তখন সংসারে অনেক কলহের সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই কলহ বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

তবে গৃহাভ্যন্তরে নারী যেকোনো বৈধ কাজ করতে পারবে। বরং অবসর সময়ে গল্প-গুজব গিবত-শেকায়াতে লিপ্ত না হয়ে যে কোনো বৈধ কাজ করাকে ইসলাম উৎসাহিত করে। গৃহাভ্যন্তরে থেকে নারীরা যেসব কাজ করতে পারে তার একটা তালিকা দেয়া হল-

১. যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তারা শিশুদেরকে বাংলা, ইংরেজি, অংক পড়াতে পারে। যারা কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়তে শিখেছে তাদের জন্য কর্মের ময়দান আরো প্রশস্ত। তারা শিশুদের সাথে সাথে বয়স্ক মহিলাদেরকেও কুরআন ও মাসআলা-মাসায়িল শিখাতে পারে। আমরা এমন অনেক মহিলার কথা জানি, যারা নিজ বাসায় বাচ্চা ও বয়স্ক মহিলাদেরকে কুরআন শরীফ পড়ানোর মাধ্যমে মাসে ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করে।

২. মহিলা ও বাচ্চাদের জামা-কাপড় সেলাইয়ের কাজ করাসহ যে কোনো হস্তশিল্পের কাজ করা যেতে পারে।

৩. কম্পিউটারের কাজ শিখে কম্পোজ, ডিজাইন ও এ জাতীয় অন্যান্য কাজ করা যেতে পারে। তবে স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে অর্ডার গ্রহণ করবে।

৪. সম্ভব হলে হাঁস-মুরগীর ফার্ম ও শাক-সবজী উৎপাদন করে আয় করতে পারে।

পরিশেষে একজন মুমিন নারীর করণীয় সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কাজ বাতলে দেয়া হচ্ছে যা পালন করলে মুসলিম নারীরা পৃথিবীতেও শান্তি পাবে এবং পরকালেও উচ্চাসনের অধিকারী হবে। যথা:

১. ঈমান-আক্বীদা পরিশুদ্ধ করা। পরকালে মুক্তির জন্য প্রধান শর্ত হল বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হওয়া। বিশুদ্ধ ঈমান শেখার জন্য মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. কর্তৃক রচিত *কিতাবুল ঈমান* পড়া যেতে পারে। (সূরা নূর- ৩৯)

২. যথাসময়ে যথানিয়মে নির্ধারিত ইবাদত-বন্দেগীগুলো আদায় করা। (সূরা আহযাব- ৩২, ৩৩)

৩. স্বামীর খিদমত করা এবং স্বামীর ন্যায়সঙ্গত সমস্ত হুকুম মান্য করা। তবে স্বামীর শরীয়ত বিরোধী কোনো আদেশ মান্য করা যাবে না। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৬১, ১১৭৪, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩২৩৭)

৪. নিজের সতীত্ব ও স্বামীর মালের হেফাযত করা। স্বামীকে না জানিয়ে নিজের পিতা-মাতা ও ভাই-বোনকেও স্বামীর অর্থ-সম্পদ না দেয়া। তবে স্বামী তার স্ত্রীকে যে টাকা-পয়সা হাত খরচের জন্য প্রদান করে, সেটা সে স্বামীকে না জানিয়ে যে কোনো ভালো কাজে ব্যয় করতে পারবে। (সূরা ত্ব-হা- ১৩২, সূরা আহযাব- ৩৩, সুনানে তিরমিযী হা.নং ১৯৫৭, ২১৪৩, সুনানে নাসায়ী; হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/৩০৮)

৫. যথাযথভাবে তার উপর অর্পিত সংসারের দায়িত্ব পালন করা এবং সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে সবিশেষ খেয়াল রাখা। (সূরা ত্ব-হা- ১৩২, সুনানে তিরমিযী হা.নং ১৯৫৭, ২১৪৩)

৬. মহিলাদের মধ্যে দীনী দাওয়াত ও তা'লীমের কাজ করা। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশিদের মধ্যে দীনের দাওয়াত ও তা'লীমের কাজ করা। নিজে সংশোধন হওয়া এবং অন্যকেও সংশোধনের দাওয়াত দেয়া। (সূরা আসর- ৩)

লেখক: শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ইবাদাত

এনামুল হক
তেজগাঁও, ঢাকা।

৯৩ প্রশ্ন : ক. মসজিদের একই তলায় একই সময় দুই প্রান্তে দুই আমল যেমন, এশার পরে এক প্রান্তে কিতাবের তালিম অপর প্রান্তে কুরআন শিক্ষার আমল করা যাবে কি না?

খ. মাগরিবের আযানের পাঁচ মিনিট পর জামাআত শুরু হয়। এই পাঁচ মিনিটে কোনো হাদীস বা মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা যাবে কি না? করলে তা বিদআত হবে কি না?

উত্তর : ক. মসজিদ যদি এত বড় হয় যে, একই তলায় একই সময়ে দুই প্রান্তে দুটি সম্মিলিত আমল করলে একটি দ্বারা অন্যটি বিঘ্নিত হয় না, তাহলে দুই পাশে দুই ধরনের আমল করতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি এক আমলের আওয়াজের দ্বারা অন্য আমলের অসুবিধা হয়, তাহলে প্রথম যেটি চালু হয়েছে সেটাকে নিজ স্থানে বহাল রেখে অন্যটি অন্য কোনো সময়ে বা অন্য তলায় করতে হবে। কারণ কিতাবের তালীম ও কুরআন শিক্ষা উভয়ই জরুরী। তাই উভয়টিই চালু রাখতে হবে। একটির কারণে অন্যটি বন্ধ করা যাবে না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা.নং ৫০৫, সুনানে নাসাঈ; হা.নং ৪০২০)

খ. মাগরিবের আযানের পর জামাআত দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অনর্থক বিলম্ব করা উচিত নয়। তবে কোনো প্রয়োজন বশতঃ যেমন রমযান মাসে মুসল্লীদেরকে ইফতার করার সুযোগ দেয়া ইত্যাদি কারণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আকাশে অধিকহারে তারকা দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা যেতে পারে। আর মুসল্লীদেরকে বাসা-বাড়ি থেকে আসার জন্য এবং উযূ-ইস্তিঞ্জা সেরে যেন নিয়মিত মুসল্লীরা জামাআতে শরীক হতে পারে সেজন্য দু-চার মিনিট বিলম্ব করাতে কোনো দোষ নেই। আর এ সময়টুকুতে যদি ইমাম সাহেব উপস্থিত মুসল্লীদেরকে উদ্দেশ্য করে কোনো দীনী কথাবার্তা বা মাসআলা-মাসায়িল বলেন তাহলে শরীয়তমতে এতেও কোনো সমস্যা নেই। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৪১৮, রদ্দুল মুহতার ১/৩৭৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/১৫৮)

আব্দুল্লাহ
ত্রিশাল, মোমেনশাহী।

৯৪ প্রশ্ন : ক. জনৈক ব্যক্তি কয়েক বছর পূর্বে বালেগ হয়। এখন তার বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লেই গোসল ফরয হয়ে যায়। এর দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে এই আশঙ্কায় সে রমযানে অতি জরুরী কাজেও বাসা থেকে বের হয় না। জানার বিষয় হল, বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার দ্বারা বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙ্গে যায় কি? ভেঙ্গে গেলে শুধু কাযা করলেই চলবে নাকি কাফফারাও দিতে হবে?

খ. আরেক ব্যক্তি প্রথম বালেগ হয় বছরের মাঝামাঝি। বালেগ হওয়ার পর সে যথারীতি রোযা রাখতে শুরু করে। কিন্তু ৮-১০টি রোযার ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, যৌন চিন্তা মাথায় এসে গেলে সে নিজের শরীর কিছুটা ঘষাঘষি করেছে। এর ফলে গোসল ফরয হয়ে গেছে। গোসল ফরয হওয়ার পর সে মাগরিব পর্যন্ত না খেয়েই ছিল এবং পরবর্তীতে রোযাগুলো কাযাও করেছে। এখন জানার বিষয় হল, রোযাগুলোর কাফফারা দিতে হবে কি না?

উত্তর : ক. বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা বীর্যপাত হয়ে গেলে গোসল ফরয হলেও রোযা ভাঙ্গে না। অতএব কাযা কাফফারা কোনটিই প্রয়োজন নেই। তাই রোযা ভাঙ্গার আশঙ্কায় জরুরী কাজ থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই। তবে রাস্তায় বের হলে নজর হিফাযত করতে হবে। অন্যথায় কঠিন গুনাহ হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৫৯, ৯৫৭৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭, আল বাহরুর রায়েক ২/৪৭৬, খাইরু ফাতাওয়া ৪/৬৬)

খ. নিজের শরীর ঘষাঘষি করার কারণে বীর্যপাত হলে গোসলও ফরয হয়, রোযাও ভেঙ্গে যায়। আর এর দ্বারা শুধু কাযা ওয়াজিব হয়; কাফফারা ওয়াজিব হয় না। তবে ইচ্ছাকৃত রোযা ভাঙ্গায় এবং ঐ কাজ করায় তার গুনাহ হবে। সুতরাং তকে গুনাহ থেকেও তাওবা করতে হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৫৯, রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৫৫)

মুআমালাত

আব্দুর রহমান
রাজশাহী

৯৮ প্রশ্ন : ক. আমি আমার শিক্ষা জীবনের শুরুর দিকে একটি মেয়েকে প্রাইভেট পড়াই, যার বয়স ছিলো দশ বছরের কিছু বেশি। এর কিছু দিন পর ১৩ বছর বয়স্ক একটি মেয়েকে পড়াই। তবে আমি তাদের দিকে কখনো তাকাইনি। নিচের দিকে তাকিয়ে পড়িয়েছি। এসব ক্ষেত্রে আমার উপার্জন হালাল ছিল কি না?

খ. বর্তমানে আমি এমন একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করি যেখানে সহশিক্ষা প্রচলিত এবং বালেগা মেয়েরা বেপর্দা হয়ে পড়াশোনা করে। আমার বর্তমান উপার্জন সম্পর্কে শরীয়তের ফায়সালা কি?

বি. দ্র. আমি চেষ্টা করলে হয়তো বিকল্প কোনো চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারবো, কিন্তু বর্তমানে নারীমুক্ত কোনো অফিস পাওয়ার সম্ভবনা খুবই কম।

উত্তর : ক. পর্দা রক্ষা করা ফরয। পুরুষদের জন্য পরনারীকে দেখা এবং বেপর্দা কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ হারাম। তেমনি মহিলাদের জন্যও পরপুরুষের সাথে বেপর্দা দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং কথাবার্তা বলা হারাম। তাছাড়া পরনারী ও পরপুরুষ নির্জনে এক ঘরে অবস্থান করাও নাজায়েয। আপনি তাদের দিকে না তাকালেও তারা হয়তো বিনা প্রয়োজনে আপনার দিকে তাকিয়েছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে নির্জনতার সুযোগ এসে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর সেয়ানা মেয়েরাও পর্দার হুকুমের ক্ষেত্রে বালেগা মেয়েদের মতই। সুতরাং আপনার জন্য পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে প্রশ্নোক্ত দুইটি মেয়েকে পড়ানো বৈধ হয়নি। তাদেরকে পড়ানোর সময়ে আপনার গুনাহ হয়েছে। এখন আপনার করণীয় হল, উক্ত গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করা। আর আপনি যে বেতন পেয়েছেন তা পড়ানোর বিনিময় হিসাবে; বেপর্দেগীর বিনিময়ে নয়। তাই বেতন হালাল হবে। (সূরা মুমিনূন- ৫২, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ১/১৩৭, রদ্দুল মুহতার ৩/৩৭, ১/৪০৮)

খ. যে প্রতিষ্ঠানে বালেগ ছেলে-মেয়েদেরকে পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করে

একত্রে পড়ানো হয় সে প্রতিষ্ঠানে পর্দার হুকুম লঙ্ঘিত হওয়ায় চাকুরী করা জায়েয নেই। তবে বেতন হালাল হবে। কারণ বেতন হল পড়ানোর বিনিময়। এখন আপনার করণীয় হল, চাকুরীতে বহাল থেকে ইস্তিগফার করতে থাকা এবং বৈধ চাকুরী তালাশ করতে থাকা। যখন কোনো বৈধ চাকুরীর ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন এই চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে। আর ঐ চাকুরীতে যতদিন বহাল থাকবেন ততদিন আপনার পর্দা তরক করার গুনাহ হতে থাকবে। (সুরা বাকারা- ১৭২, সূরা নূর- ৩০-৩১, সহীহ বুখারী; হা.নং ২০৫৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭০৭, রদ্দুল মুহতার ৬/৪৬২)

আব্দুল্লাহ
খুলনা

৯৯ প্রশ্ন : আমি অর্নাস দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। আমার পিতা আমার ব্যয় বহনে সক্ষম নন। আমি একটি বালেগা মেয়েকে প্রাইভেট পড়াই। এছাড়া আমার রোজগারের আর কোনো পথ নেই। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সৌজন্যে বৃত্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হলে আমিও বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করি। যেভাবেই হোক আমি বৃত্তির চল্লিশ হাজার টাকা পেয়েছি। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে, বৃত্তির টাকাটা একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক দিয়েছে। এখন আমার জন্য বৃত্তির ঐ টাকা উত্তম নাকি বালেগা মেয়েকে পড়ানো টাকা উত্তম?

উত্তর : বালেগা মেয়েকে পড়ানোর দ্বারা পর্দার হুকুম লঙ্ঘন হচ্ছে। এ কারণে আপনার গুনাহ হচ্ছে। কিন্তু বেতন হালাল। আপনি জরুরি ভিত্তিতে ছেলে কিংবা বাচ্চা মেয়েদের প্রাইভেট গ্রহণের চেষ্টা করুন। আল্লাহর উপর ভরসা করে খোঁজা শুরু করলে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

আর ব্যাংক কর্তৃক বৃত্তি বাবদ আপনাকে যে টাকা দেয়া হয়েছে, তা যদি তারা তাদের কমন ফান্ড থেকে দিয়ে থাকে তাহলে তা নিজে ব্যবহার করার অবকাশ আছে। তবে সুদী ব্যাংকের এ ধরনের অনুদান গ্রহণের প্রতি ভবিষ্যতে আগ্রহী না হওয়া চাই। আর যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, উক্ত টাকা ব্যাংকের সুদ থেকে দেয়া হয়েছে, তাহলে তা নিজে ব্যবহার না করে গরীব-মিসকীনদেরকে দান করে দিবেন। (সূরা নূর- ২৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ২০৫৯, মুসনাদে আহমাদ ১/৩১০, মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১৬৬, তাবয়ীনুল হাকায়েক ৭/৪১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪২১, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৬১৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/১৬৫)

বিবিধ

সাইফুল্লাহ শিবলী
সুবহানবাগ, ঢাকা।

১০২ প্রশ্ন : আত্মহত্যার হুকুম কি? আত্মহত্যাকারীর জানাযা নামায মহল্লার ইমাম, খতীব বা মুআযযিন পড়াতে পারবে কি না? মসজিদের মাইকে এ ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : আত্মহত্যা জঘন্য পাপ। তবে যেহেতু ইসলামী শরীয়তে প্রত্যেক মুসলমানের জানাযা পড়ার নির্দেশ রয়েছে, তাই তার জানাযা পড়তে হবে। তবে সমাজের বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ তার জানাযায় শরীক হবে না। এ হিসেবে মহল্লার ইমাম-খতীব, মুআযযিন যদি তার জানাযা না পড়াতে চায় তাহলে এরও অবকাশ আছে। যাতে সাধারণ লোকজন এ অন্যায়ের জঘন্যতা বুঝে তা থেকে বিরত থাকে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এক মুসলিম আত্মহত্যা করেছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযায় শরীক হননি।

আর আত্মহত্যাকারীর বিষয়টি যত কম জানাজানি হয় ততই ভাল। সুতরাং তার জানাযার নামাযের কথা মাইকে ঘোষণা না করা উচিত। বিশেষ করে মসজিদের মাইকে আত্মহত্যাকারীর ব্যাপারে এলান করা তো মোটেই উচিত হবে না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯৭৮, শরহে মুসলিম লিন্নববী ৭/৪৮, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২৫৩৩, বাদায়িউস সানায়ে ২/৪৭, রদ্দুল মুহতার ৩/১২৭, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৫০, ফাইযুল কদীর ৫/১৪, আততামহীদ ২/৬৪৯, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩৮/২১৪)

আব্দুল করীম
মাগুরা।

১০৩ প্রশ্ন : আমি জনৈক আলেমকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, হাদীসটি কোন কিতাবে আছে? তিনি প্রশ্ন শোনেই রেগে যান এবং বলেন যে, 'রেফারেন্স উলামায়ে কেরামের বিষয়, তোমার জানার দরকার কি?' প্রশ্ন হল, হক্কানী উলামায়ে কেরামের কাছে দলীল জানতে চাইলে 'এটা একটা রোগ' বলে যদি তারা ঝাড়ি দেন, পক্ষান্তরে লা-মাযহাবীরা *বুখারী মুসলিমের* দলীল খুলে দেখায়, তাহলে তরুণ প্রজন্মের লা-মাযহাবী হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি খুবই বেশি। উলামায়ে কেরামের এ মানসিকতা পরিবর্তন জরুরী নয় কি?

উত্তর : হাদীসের রেফারেন্স জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত আলেমের রেগে যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু এটাও ঠিক যে, হাদীস, হাদীসের কিতাব, হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের (অর্থাৎ যারা ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম নয়) প্রশ্ন করাটাও অনর্থক। কারণ এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্যও বিশেষ পর্যায়ের ইলম অর্জন করতে হয়।

ইসলামী শরীয়তের বিধান হল, এমন মুসলমান যাদের নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা করে আলেম হওয়ার সুযোগ হয়নি, তারা নির্ভরযোগ্য মুফতীদের কাছ থেকে ইসলামের হুকুম আহকাম জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। বিশেষ করে গবেষণা-নির্ভর মাসআলার ক্ষেত্রে এটা কোন হাদীসে আছে, কোন আয়াতে আছে এরূপ দলীল জিজ্ঞেস করার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রয়োজন তাদের নেই। আর আলেমদেরকে কোনো মাসআলার উপস্থিত হাদীস জিজ্ঞেস করা এবং এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং আলেমদের প্রতি অজ্ঞতার ধারণা করে নিজেই হাদীসের কিতাব এবং ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দেয়ার রোগ আজকাল এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। যারা এ রোগের শিকার তাদের গোমরাহী অনিবার্য। কারণ এরা ডাক্তারের উপর নারাজ হয়ে নিজেই বই ঘেঁটে চিকিৎসা শুরু করে দেয়া রোগীর নামান্তর।

হ্যাঁ, কারো যদি আত্মতৃপ্তির জন্য দৈনন্দিন আমলের হাদীস জানতে ইচ্ছা হয়, তাহলে তার উচিত আলেমদের সাথে পরামর্শ করে এ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য বই খুব মনোযোগসহ পড়া। পর্যায়ক্রমে ছোট থেকে বড়, সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত বই পড়তে পারলে কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. প্রণীত *হাদীসে রাসূল*, *তুহফাতুল হাদীস*, *মাযহাব ও তাকলীদ*, মুফতী মিযানুর রহমান কাসেমী লিখিত *হানাফী মাযহাবের সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ*, মাওলানা আব্দুল মতীন রচিত *দলিলসহ নামাযের মাসায়েল* মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ অনুদিত *নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায* পড়া যেতে পারে।

উলামায়ে কেরামের পরামর্শ মোতাবেক না চলে লা-মাযহাবীদের কথায় উৎসাহিত হয়ে নিজে নিজে *বুখারী*, *মুসলিম* ও ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলে গোমরাহী সুনিশ্চিত। তার গোমরাহীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে; কোন হক্কানী আলেম বা আলেম সমাজ নয়। (সূরা নাহল- ৪৩, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৩৩৬, উসূলুল ইফতা; পৃষ্ঠা ৮১-৮৩, খুতুবাতে হাকীমুল উম্মাত ৬/১৭৫)

তিন তালাকে এক তালাক
আহলে হাদীসদের একটি ফাতওয়া ও তার বিশ্লেষণ

১০৪ প্রশ্ন : আমি ২০০৭ ইং সালে জান্নাত আরাকে বিবাহ করি। আমাদের একটি পুত্র সন্তান আছে। আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বশত বনিবনা না হওয়ার দরুণ গত ২রা জানুয়ারী ২০১২ ইং সনে কাজী অফিসে গিয়ে প্রচলিত আইন অনুযায়ী একত্রে তিন তালাকের কাগজে স্বাক্ষর করি। কাগজে এ কথা লেখা ছিল '১,২,৩ তালাকে বায়েন দিয়া, মৌখিক উচ্চারণ করিয়া আমার স্ত্রী জান্নাত আরাকে তালাক দিয়া বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলাম'। কাজী সাহেব আমাকে পরপর তিন মাসে তিনটি নোটিশ দিতে বলেন। আমি প্রথম মাসে একটি নোটিশ ডাকের মাধ্যমে পাঠাই। কিন্তু আমার স্ত্রী সেটা গ্রহণ করেনি। এরপর আমি আর কোনো নোটিশ পাঠাইনি। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত আমার স্ত্রী ও বাচ্চার ভরণ-পোষণ দিয়ে আসছি। আমার প্রশ্ন হল, একত্রে তিন তালাক দেয়ায় তিন তালাক হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে ঐ স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার কোনো উপায় আছে কি? কুরআন-সুন্নাহের আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
মুহাম্মাদ খালেকুল বারিয়া
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

বি.দ্র. মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ৭৯/ক উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪ (আহলে হাদীস মাদরাসা) থেকে প্রশ্নোক্ত সমস্যার কথা বলে একটি ফাতওয়া চাওয়া হয়েছিল। তারা যে সমাধান দিয়েছেন তা হুবহু এখানে উল্লেখ করা হল-

'কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী আপনার স্ত্রী জান্নাত আরার উপরে এক তালাকে রজয়ী কার্যকর হয়েছে। এখনো আপনি দুই তালাকের মালিক। আপনারা স্বামী স্ত্রী সম্মত থাকলে এবং দাম্পত্য জীবন যাপন করতে চাইলে বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে যেতে পারেন।

কুরআন থেকে দলিল:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

অর্থ: তালাক দুইবার, অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিহিতভাবে রাখতে হবে অথবা সৎভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। (সূরা বাকারা-২২৯)

এখানে উল্লেখ্য যে, একবারের অর্থ হচ্ছে, প্রতি মাসে একটি তালাক কার্যকর হবে। অতএব, দুইবারের অর্থ হচ্ছে ২ মাসে ২টি তালাক। একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক কার্যকর হবে না। বরং শুধুমাত্র এক তালাক কার্যকর হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৫১, আধুনিক প্রকাশনী ৪৮৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৭৬২)

عن بن عباس رضى الله تعالى عنه قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا قال فقال فى مجلس واحد؟ قال نعم. قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت. قال فرجعها.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রুকানা বিন আবদে ইয়াযীদ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলেন। অতঃপর তিনি দুঃখিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে কীভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছ? রুকানা বললেন জী হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা এক তালাক হয়েছে। তুমি চাইলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পার। অতঃপর রুকানা তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন। (মুসনাদে আহমাদ ১/২৬৫, মুসনাদে আবি ইয়ালা ২৪৯৫, বায়হাকী ৭/৩৩৯)

এক সাথে তিন তালাক বা বাইন তালাক দিলে শুধুমাত্র এক তালাকে রজয়ী কার্যকর হবে।

প্রচলিত হিল্লা প্রথা হারাম

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل و المحلل له.

অর্থ : আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হিল্লাকারী এবং যার জন্য হিল্লা করা হবে উভয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৩)

জাবাব দাতা: শাইখ মুস্তফা কাসেমী
প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।'

আহলে হাদীস মাদরাসা থেকে যে সমাধান দেয়া হয়েছে সেটা কতটুকু সঠিক? বিস্তারিত জানাবেন বলে আশা করি।

উত্তর : প্রত্যেক বিবাহিত ও বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য বিবাহ, তালাক এবং স্বামী-স্ত্রীর হক সংক্রান্ত মাসাইল জেনে নেয়া ফরযে আইন। এ ফরযের প্রতি অবহেলা করা বড় গুনাহের কাজ। জরুরী মাসাইল না জানার কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দাম্পত্য জীবনে চরম সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

ইসলামী শরীয়তে বৈধ কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের বৈধ কাজ তালাক দেয়া। দাম্পত্য জীবনের চরম কোন সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শরীয়তে তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর সংকট নিরসনে এক তালাকই যথেষ্ট। তাই একসাথে একাধিক তালাক দেয়া গুনাহের কাজ। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি তার স্ত্রীকে একসঙ্গে একাধিক তালাক দেয় তাহলে শরীয়ত মতে একাধিক তালাকই পড়বে, এক তালাক নয়।

অতঃএব আপনার প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী তালাক নোটিশে আপনার স্বাক্ষরিত কথা/লিখা '১,২,৩ তালাকে বায়েন দিয়ে মৌখিক উচ্চারণ করিয়া...' এর মাধ্যমে আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গিয়েছে, তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে জান্নাত আরার নিকট নোটিশ পাঠানো এবং তার পক্ষ থেকে নোটিশ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

সুতরাং আপনারা যদি উভয়ের সম্মতিতে পুনরায় দাম্পত্য জীবন শুরু করতে চান তাহলে শরয়ী হালালার মাধ্যমে করতে হবে।

শরয়ী হালালার সূরত হল : বেগম জান্নাত আরা তিন তালাকের ইদ্দত শেষে তথা তালাকের পর পূর্ণ তিনটি হায়েয অতিক্রান্ত হওয়া বা গর্ভবতী হলে গর্ভপ্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করে তালাকের শর্ত করা ব্যতীত অন্য কারো সাথে বিবাহ বসবে। বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে দৈহিক মেলা-মেশা করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় বা মৃত্যু বরণ করে তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালন শেষে, আপনি ও আপনার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী সম্মত থাকলে বিবাহের সকল শর্ত বজায় রেখে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।

উল্লেখ্য, প্রচলিত হালালা পদ্ধতি অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামীর নিকট তালাক দেয়ার শর্তে বিবাহ দিলেও তার দ্বারা হালালার কাজ হয়ে যাবে। যদিও শর্ত করার কারণে গুনাহ হবে। কিন্তু স্বামী কর্তৃক ১,২,৩ তালাকে বায়েন বলে তালাক দেয়ার পরেও তিন তালাককে এক তালাকে রজয়ী বলে ফাতওয়া দেয়া আর তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে শরীয়তসম্মত হালালা ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে বলা, তেমনিভাবে তালাকে রজয়ী পতিত হয়েছে মর্মে ফাতওয়া দিয়ে আবার বিবাহ দোহ্রাতে

বলা এ সবই কথিত শাইখের মাসাইল সম্পর্কে মূর্খতার জ্বলন্ত প্রমাণ। নিম্নের দলীলসমূহ মনোযোগ সহকারে পড়লে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে-

কুরআনুল কারীম থেকে:

(١) قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (سورة البقرة :٢٢٩)

অর্থ : এই তালাক দুইবার। অতঃপর রাখা নিয়মানুযায়ী অথবা বর্জন করা সদ্ভাবে। (বঙ্গানুবাদ ইমদাদিয়া)

(٢) قال الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (سورة البقرة : ٢٢٩)

অর্থ : অনন্তর যদি কেহ (তৃতীয়) তালাক দেয় স্ত্রীকে, তবে এই স্ত্রী তাহার জন্য হালাল থাকিবে না ইহার পর যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা হয়। (বঙ্গানুবাদ ইমদাদিয়া)

ইমাম আবূ বকর আল জাস্‌সাস রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আহকামুল কুরআনে* উল্লিখিত দুটি আয়াত ذكر الحجج لايقاع الطلاق الثلاث معا (একসাথে তিন তালাক পতিত হওয়ার দলীল) শিরোনামে উল্লেখ করে বলেন,

الآية يدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنها،.... فوجب الحكم بإيقاع الجميع على أي وجه أوقعه من مسنون أوغير مسنون ومباح أومحظور.

অর্থাৎ আয়াতদ্বয় তিন তালাক একসাথে পতিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে যদিও তা নিষিদ্ধ... সুতরাং যেভাবেই তালাক দেয়া হোক না কেন চাই তা সুন্নাহ পন্থায় হোক বা এর পরিপন্থি, আবশ্যিকভাবেই সবগুলো পতিত হবে। (আহকামুল কুরআন ১/৫২৭)

(٣) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي مَقْصُودِ الْآيَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ بَابُ جَوَازِ الثَّلَاثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}

অর্থাৎ ইবনে আরাবী রহ. প্রথমোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে ইমাম বুখারী রহ. এর কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আয়াতটিকে তিন তালাক একসাথে বৈধ হওয়ার অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। (আহকামুল কুরআন ১/২২৪)

হাদীস থেকে :

(١)... فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

অর্থ : হযরত উওয়াইমির রাযি. স্বীয় স্ত্রীর সাথে লি'আন থেকে অবসর হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি তাকে স্ত্রী রূপে রেখে দিই তাহলে তো আমি মিথ্যা বলেছি। এরপর রাসূলের অনুমতির পূর্বেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৫৯)

তিন তালাক যদি অবৈধ ও অকার্যকর হয়ে থাকে তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হযরত উওয়াইমির রাযি. নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন কেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে কিছু বললেন না কেন?

(٢)... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

(২) অর্থ : আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। তারপর সে (অন্যত্র) বিবাহ বসলে দ্বিতীয় স্বামী (তাকে মিলনের পূর্বেই) তালাক দিলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, উক্ত মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে? (জবাবে) বললেন, না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তার স্বাদ আস্বাদন করে, যেমন আস্বাদন করেছিল প্রথম স্বামী। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৬১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৩৩)

জ্ঞানীমাত্রই এই হাদীস দ্বারা বুঝতে পারবে যে, তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকর হয়। তিন তালাক এক তালাকে রজয়ী হয়ে যায় না।

হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণের নিকট হাদীসের ব্যাখ্যা :

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী রহ. বলেন,

(١)...واحتج الجمهور بقوله:ومن يتعد الخ:قالوا معناه ان المطلق قد حدث له ندم فلا يمكن تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لاتقع لم تقع طلاقه هذا الا رجعيا فلا يندم

অর্থা : ...তিন তালাক পতিত হলেই কেবল সে লজ্জিত হয় অন্যথায় লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই। (শরহে নববী ৫/৯৬)

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার শ্রেষ্ঠ হাদীস শাস্ত্রবিদ হাফিয ইবনুল হাজার রহ. বলেন,

(٢)... وأجيب بان الاحتجاج به من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة فلو كان ممنوعا لا نكره.

অর্থ : রাসূল কর্তৃক হযরত উওয়াইমির রাযি. তিন তালাক প্রদান থেকে বারণ না করা একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাক পতিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করতেন। (ফাতহুল বারী ৯/৩১৯)

উল্লেখ্য যে, শাইখ মুস্তফা সাহেব সহীহ বুখারীর ৫২৫১ নং হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে লিখেছেন, 'একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক কার্যকর হবে না বরং এক তালাক কার্যকর হবে'। অথচ এই বাক্যটি সহীহ বুখারীর ৫২৫১ নং হাদীসে উল্লেখ নেই। তিনি নিজের মনগড়া কথাকে ইমাম বুখারীর সাথে সম্পৃক্ত করে ইলমী আমানাতের কত বড় খেয়ানত করলেন! এরপর তিনি নিজের দাবী প্রমাণে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন। অথচ হাদীসটি বুখারী, মুসলিমসহ অন্য কোনো সহীহ হাদীসের কিতাবে নেই এবং হাদীসটি সহীহও নয়। কত চমৎকার দলীল! আহলে হাদীস ভাইয়েরা নিজের দাবী প্রমাণে যঈফ হাদীসের আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। অথচ হানাফীরা বুখারী মুসলিম ছাড়া অন্য কোনো সহীহ হাদীস পেশ করলেও তারা মানতে প্রস্তুত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্ত রেওয়ায়েত সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের অভিমত :

(١) ومن باب فسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

ইমাম খাত্তাবী রহ. আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মা'আলিমুস সুনানে একটি শিরোনাম রচনা করেছেন 'তিন তালাকের পর পুনরায় দ্বিতীয় বিবাহ ছাড়া ফিরিয়ে নেয়া রহিত' হওয়া সম্পর্কে। অতঃপর সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

قال الشيخ: فى اسناد هذا الحديث مقال لأن ابن جريج انما رواه عن بعض بنى رافع ولم يسمعه والمجهول لا يقوم به الحجة

অর্থ : এই হাদীসের সূত্র নিয়ে আলোচনা সমালোচনা রয়েছে। কেননা ইবনে জুরাইজ রহ. এটি রাফে-এর কোনো এক পুত্র থেকে বর্ণনা করেন। আর তিনি তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন বলেও প্রমাণ নেই। আর অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যায় না। (মা'আলিমুস সুনান ৩/২০৩)

তিনি আরো বলেন,

(٢) قال ابن المنذر فغير جائز ان يظن بابن عباس رض يحفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم شيا ثم يفتى بخلافه

অর্থ : 'ইবনুল মুনযির রহ. বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস রাযি. সম্পর্কে এমন ধারণা করা কখনোই ঠিক হবে না যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক রকম শুনেছেন আর লোকদেরকে ফাতওয়া দিয়েছেন এর বিপরীত।' উল্লেখ্য যে, ইবনে আব্বাস রাযি. এর ফাতওয়া হলো, একত্রে তিন তালাকে তিন তালাকই

পতিত হয়। (মা'আলিমুস সুনান ৩/২০৫)

(৩) قال الامام النووی رح فی شرح صحیح مسلم کتاب الطلاق عن هذا الحديث أی حديث ركانة- وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانه طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين.

অর্থ : ইমাম নববী রহ. বলেন 'তিন তালাকে এক তালাকের প্রবক্তাগণ রুকানাহ রাযি. এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ দেয়। আর এটি একটি যয়ীফ রেওয়ায়েত যা অজ্ঞাত রাবীদের থেকে বর্ণিত। (শরহে নববী ৫/৬৮)

তিনি আরো বলেন,

فقد يجمع الصحابة على النسخ...

অর্থ : সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এ রেওয়ায়েত রহিত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (শরহে নববী ৫/৬৮)

(৪) সহীহ বুখারীর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকার হাফিয ইবনে হাজার রহ. তার প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারী*তে উল্লেখ করেছেন যে, চারটি বড় বড় কারণে রুকানা রাযি. এর ঘটনা প্রত্যাখ্যাত।

أحدها:أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما والثاني: معارضته بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة الرابع: أنه مذهب شاذ فلا يعمل به.

অর্থ : ১. উক্ত ঘটনার রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং তার উস্তাদ সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। ২. হাদীসটি ইবনে আব্বাস রাযি. এর তিন তালাক পতিত হওয়ার ফাতওয়ার বিপরীত। (রাবীর হাদীস যদি তার ফাতওয়ার খেলাফ হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না।) ৩. রুকানা রাযি. তার স্ত্রীকে 'আলবাত্তা তালাক' দিয়েছিলেন, আবু দাউদ রহ. এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ৪. একত্রে তিন তালাকে এক তালাক হওয়ার মতটি শায বা বিরল তাই তার উপর আমল করা যাবে না। (ফাতহুল বারী ৯/৩১৪)

ইমাম যাহিদ আল কাউসারী রহ. *আল ইশফাক আলা আহকামিত তালাক* গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত উক্ত রেওয়ায়েত সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আলোচনার কয়েকটি অংশ উল্লেখ করছি,

(৫) على ان هذا الحديث منكر كما يقول الجصاص وابن الهمام لمخالفته لرواية الثقات الأثبات، ومعلول كما يقول ابن حجر في تخريج احاديث الرافعي.

অর্থাৎ 'তাছাড়া এই হাদীসটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) যেমনটি ইমাম জাস্সাস ও ইবনুল হুমাম রহ. বলেছেন। কেননা হাদীসটি অতি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। আর ইবনে হাজার রহ. এর নিকটে হাদীসটি মা'লূল। (অর্থাৎ সূক্ষ্ম ক্রুটিযুক্ত হাদীস)। (আল ইশফাক আলা আহকামিত তালাক; ২৫৩)

উল্লেখ্য, মুনকার আর মা'লূল হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্ত হাদীস কোনভাবেই প্রমাণযোগ্য হতে পারে না। অতএব, এমন একটি দুর্বল বর্ণনাকে পুঁজি করে তিন তালাককে এক তালাকে রজয়ী প্রমাণের অপচেষ্টা মূর্খতা ও হঠকারিতা বৈ কিছু নয়।

এ সম্পর্কে চার ইমামের মাযহাব

(১) হানাফী মাযহাব :

وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء .

অর্থ : অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত হলো তালাকে বিদ'আতও পতিত হয় (তালাকে বিদ'আত হলো একত্রে তিন তালাক দেয়া)। (বাদায়েউস সানায়ে' ৪/২২৬)

(২) মালেকী মাযহাব :

أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى أيلزمه ذلك أم لا قال قال مالك يلزمه ذلك.

অর্থ : কেউ যদি স্বীয় গর্ভবতী স্ত্রীকে এক মজলিসে বা ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে তিন তালাক দেয় সে ক্ষেত্রে আপনি কী বলেন? ইমাম মালেক রহ. বললেন, তিন তালাক পতিত হবে। (মুদাওওয়ানাতুল কুবরা ২/৪)

(৩) শাফেয়ী মাযহাব :

(قال الشافعي) رحمه الله: فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه.

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, হযরত উওয়াইমির রাযি. রাসূলের সামনে তিন তালাক দিয়েছিলেন (একত্রে), তা অবৈধ হলে নিশ্চয়ই তিনি নিষেধ করতেন। (কিতাবুল উম ৬/৩৫২)

(৪) হাম্বলী মাযহাব :

وان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره

অর্থ : এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিনটিই পতিত হবে দ্বিতীয় বিবাহ ছাড়া আর বৈধ হবে না। (আল মুগনী ৭/১০৪)

উলামায়ে হারামাইনের গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া

সৌদী সরকার উলামায়ে হারামাইন এবং আরব-বিশ্বের নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত একটি গবেষণা কমিটি তৈরী করেছেন এবং সে কমিটির স্বীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ দেশের সমস্ত বিচার বিভাগে প্রয়োগ হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং সৌদী বাদশাহ নিজেও এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন।

উক্ত গবেষণা মজলিসে তিন তালাকের মাসআলা বিশ্লেষণের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। মজলিস এই মাসআলা কুরআন হাদীসের নুসূস ছাড়াও তাফসীর ও হাদীসের ৪৭টি কিতাব থেকে গবেষণা করে এ মর্মে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এক শব্দে এক সাথে তিন তালাক দিলেও তিন তালাকই পতিত হয়।

তথাকথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা উলামায়ে হারামাইনের ফাতওয়াকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। তাই তাদের ফাতওয়াটিও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হল, যেন আহলে হাদীস ভাইদের বুঝতে সহজ হয়। (বিস্তারিত দেখুন *আহসানুল ফাতাওয়া* ৫/২২৩-৩৭২) একত্রে তিন তালাকে তিন তালাকই পতিত হয়; এক তালাকে রজয়ী নয় এ মর্মে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহে আরো আলোচনা পাবেন,

আল হেদায়া ২/৩৫৫, *আল কেফায়া* (*ফাতহুল কাদীরের* টিকায়) ৩/৩২৯, *রদ্দুল মুহতার* ৩/২৩৩, *আল বাহরুর রায়েক* ৩/৪৪১, *আল মাবসূত* ৬/৫, *ফাতাওয়া তাতারখানিয়া* ৪/৩৮১, *আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ* ২৯/৩৪।

শেষ কথা

একসাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক পতিত হওয়ার ফাতওয়াটি কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মূর্খতা ও হঠকারিতার মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। 'তারা বিশেষ উদ্দেশ্যে' বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হাদীসের আশ্রয় নিচ্ছে। উপরন্তু হাদীসের ব্যাখ্যাও করছে ভুল। মূলত হাদীসটি ছিল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে তার স্ত্রীকে তালাক, তালাক, তালাক এইভাবে তিনবার তালাক বলেছে, এভাবে তিন তালাক বললে পরবর্তী দুই তালাকের মধ্যে বয়ান বা তাকীদ এর সম্ভাবনাও থাকে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ১,২,৩ সংখ্যা উল্লেখ করে বা তিন তালাকে বাইন বলে তালাক দিল তার স্ত্রীর উপরেও এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে বলা পাগলের প্রলাপ বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা আহলে হাদীস ভাইদেরকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। আমীন।